www.banglainternet.com
represents

SHIKHKHA O BIGGAN : NOTUN DIGANTO

Abdullah Al Muti

শিক্ষা ও বিজ্ঞান ঃ নতুন দিগন্ত

আবদুল্লাহ আল-মুতী

মুখবন্ধ

শিক্ষা ও বিজ্ঞান একালের মানব সভ্যতার অতি গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দিক; অথচ একই সঙ্গে এগুলি আমাদের দেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রের অপেক্ষাকৃত অবহেলিত, পশ্চাৎপদ ও অনালোচিত দিকও। এই দু'টি বিষয় প্রসঙ্গে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কর্মশালা, আলোচনাচক্র ইত্যাদিতে পঠিত কিছু রচনা এ বইতে সংকলিত হয়েছে ।

রচনাগুলির মধ্যে বেশ ক'টি মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । এই প্রকল্পে গত চার–পাঁচ বছরে দেশের অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা চার হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ–সুবিধে বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । প্রকল্পের একটি প্রধান দিক হল শিক্ষক–শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের কর্মকালীন সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা । এ উদ্দেশ্যে দেশের নানা অঞ্চলে শিক্ষক–প্রশিক্ষণ কলেজগুলিতে ন'টি মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে ।

মূলত বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সমাজের সংশ্লিষ্টতা, বিজ্ঞান শিক্ষার নানা দিক এই রচনাগুলির বিবেচ্য বিষয়। অবশ্য সেই সঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন, পরিবেশের সংকট, সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ও আলোচনায় এসেছে । আশা করা যায় যে, আজ যে সব গভীর সমস্যায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আক্রান্ত সেগুলি এবং বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যা এবং আগামী দিনে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের নানা সম্ভাবনার উপলব্ধিতে এই রচনাগুলি সহায়ক হবে ।

যে সব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এসব কর্মশালা, আলোচনাচক্র প্রভৃতির আয়োজন করেছিলেন তার মধ্যে মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্প ছাড়াও রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ বিজ্ঞান শিক্ষা সমিতি, বাংলাদেশ প্রাণিবিদ্যা সমিতি, বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি, কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ঐতিহ্য পরিষদ (চট্টগ্রাম) প্রভৃতি। তাঁদের সবার কাছে এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ।

আর সেই সঙ্গে সদ্যসমাপ্ত প্রকল্পের পরিচালক ও অন্যান্য সকল পর্যায়ের সহকর্মী, বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীবৃন্দ এবং অন্য যাঁরা রচনাগুলি প্রণয়নে ও প্রকাশনায় সহায়তা করেছেন তাঁদেরও সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ।

আবদুল্লাহ আল–মুতী

সবার জন্য শিক্ষা

শিক্ষা দর্শন — বাংলাদেশে ১১
সর্বজনীন শিক্ষাঃ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ১৯
সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এত জরুরি কেন ২৭
টেলিভিশন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ৩১

সবার জন্য বিজ্ঞান

বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ৩৭
মানব সম্পদ উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা ৪৫
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সমাজ ও শিক্ষা ৫৩
বিজ্ঞান, সমাজ ও শিক্ষার্থী ৫৯

পরিবেশ ও শিক্ষা

পরিবেশ ও জীবজগৎ ৬৯
শিক্ষা ও পরিবেশ-চেতনা ৭৪
বিপন্ন পরিবেশ ও শিক্ষা-ব্যবস্থা ৭৮
পরিবেশ, প্রযুক্তি ও নারী ৮৯

নতুন দিগন্ত

আরেক দশকের সামনে দাঁড়িয়ে ৯৯
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও তৃতীয় বিশ্ব ১০৩
একুশ শতকের মুখোমুখি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ১২১
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়ন ১৩৪

সবার জন্য শিক্ষা

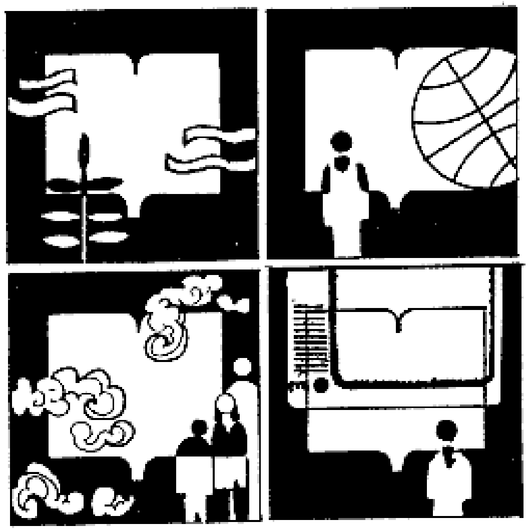

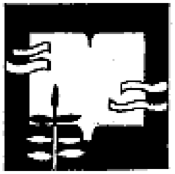

শিক্ষা দর্শন – বাংলাদেশে

শিক্ষা প্রসঙ্গে কোন আলোচনার শুরুতেই মানুষের কথা মনে পড়ে। তার কারণ নিশ্চয়ই এ নয় যে, শিক্ষার প্রয়োজন শুধু মানুষের জন্য। কেননা শিক্ষা নিয়ে নানা কৌশল শেখানো যায় ময়না, তোতাপাখি, কুকুর, বাঘ, হাতি, ছাগল এমনি অনেক পশু–পাখিকেও।

তবু মানুষের সঙ্গে শিক্ষার যে ঘনিষ্ঠতা এমন আর কোন প্রাণীর বেলায় নয়। আসলে মানুষ যতটা না মানুষ তার জন্মের সুবাদে, তার চেয়ে অনেক বেশি তার সামাজিক পরিবেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণের বদৌলতে। প্রাণীদের মধ্যে অধিকাংশই সন্তান–সন্ততির শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামায় না মোটেই; তাদের সন্তান–সন্ততিও সহজেই জীবন নির্বাহ করে সহজাত প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব অনেকখানি পরিমাণে নির্ভরশীল সামাজিক শিক্ষার ওপরে।

এই সামাজিক শিক্ষা যে সব জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এক তা নয়। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ জীবন–দৃষ্টি, অতীত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর আগামী দিনের স্বপ্ন তাদের শিক্ষার কাঠামোকে প্রভাবিত করে। অবশ্য পৃথিবীর দেশে দেশে নানা মানব গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ বাড়বার ফলে সমগ্র মানব সভ্যতার এক সাধারণ ঐতিহ্য আজ সৃষ্টি হয়েছে — আর এই সাধারণ ঐতিহ্যের মধ্যেও দেশে দেশে নানা ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে।

এই শিক্ষা ব্যাপারটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে সেকথা রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়েছিল সোভিয়েত দেশ দেখতে গিয়ে। সেখানে তিনি বলেছেন ঃ

> আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল — তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত। যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক। যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল— তারা সমাজের অন্ধকুঠরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এতকালের মরা গাঙ্গে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। (রাশিয়ার চিঠি, পৃঃ ৩)

এর পরপরই নিজের দেশে শিক্ষার দৈন্যের ফলাফলের কথাও বলেছেন তিনিঃ

> ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। (ঐ, পৃঃ ৫৮)

এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে দীনতা সেদিন রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা দিয়েছিল তা এই প্রায় ছ' দশক পরেও মনে হয় একইভাবে সত্য । সাধারণভাবে মানুষের সমাজ বিকাশে শিক্ষার যে বিপুল গুরুত্ব তা যুগে যুগে নানা মনীষী, দার্শনিক, ধর্মপ্রচারক, সমাজনেতার চোখে ধরা পড়েছে । সেই আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক সভ্যতার সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত শিক্ষাতত্ত্ব নিয়ে, ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব কত বেশি, শিক্ষা কি, কেন, কার জন্য, কিভাবে — এমনি সব নানা প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনা কম হয় নি ।

এসব চিন্তাচেতনা থেকে এযাবৎ এদেশে আমরা যে খুব একটা লাভবান হয়েছি তা বলা শক্ত । কেননা লাভবান হলে আমাদের আজকে এই দীন দশা থাকবার কথা ছিল না । এই শতকের শুরুতে ইংরেজ মনীষী এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ বলেছিলেন, সভ্যতা ও সর্বনাশের মাঝখানে যা দাঁড়িয়ে তা হল শিক্ষা । এদেশে রাষ্ট্রনায়ক থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত যে কোন লোকের মতামত বিচার করলে মনে হবে আমরা যতটা না দাঁড়িয়ে সভ্যতার কাছে তার চেয়ে অনেক কাছাকাছি সর্বনাশের । এ অবস্থায় শিক্ষা ব্যাপারটিকে জোরে আঁকড়ে ধরা ছাড়া আসন্ন সর্বনাশের হাত থেকে মুক্তির কোন পথ আছে বলে মনে হয় না ।

শিক্ষার নানা লক্ষ্য

আধুনিক সভ্যতার সূতিকাগার হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে গ্রীক সভ্যতাকে । আজকের দার্শনিক–বৈজ্ঞানিক–সামাজিক অনেক চেতনার বিকাশ মূলত গ্রীক মনীষীদের চিন্তাপদ্ধতিকে ভিত্তি করে । উল্লেখ্য যে, এই গ্রীক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা শিক্ষার ওপর বিপুল গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । এবং এটা মোটেই আশ্চর্যের নয় যে, সেকালের গ্রীক সেনাপতি বা রাষ্ট্রনায়কদের কথা লোকে আজ যতটা না মনে রেখেছে তার চেয়ে অনেক বেশি মনে রেখেছে সক্রেটিস–প্লেটো–অ্যারিস্টটল প্রমুখ গ্রীক দার্শনিক–পণ্ডিতদের কথা । এঁরা নিজেরা শিক্ষক ছিলেন এবং বহুমুখী শিক্ষাকর্মে ধারাবাহিক পরম্পরায় যুক্ত থেকে নানা শিক্ষাতত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন ।

সক্রেটিসের (৪৭৩–৪০০ খ্রীঃপূঃ) চোখে শিক্ষা হল জিজ্ঞাসার মাধ্যমে সত্যের সন্ধান— আর এই সত্য উদ্‌ঘাটনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একই পথের সহযাত্রী । প্লেটো জ্ঞানচর্চার চারটি পর্যায় বা স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন । প্রথম স্তরে রয়েছে জানা, দ্বিতীয় স্তরে বিশ্বাস, তৃতীয় স্তরে স্বরূপ–অন্বেষা, চতুর্থ স্তরে সমাধান ও নিশ্চয়তা । অ্যারিস্টটল শিক্ষাকে দেখেছেন মানুষের সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধনের পন্থা হিসেবে ।

শিক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণার বিকাশ ঘটাবার ক্ষেত্রে আরো যেসব দার্শনিক অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন জাঁ জাক রুশো (১৭১২–৭৮) । আঠার শতকের এই প্রকৃতিবাদী চিন্তানায়ক সকল কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত স্বাভাবিক পথে মানুষের শৃঙ্খলহীন বিকাশের কথা বলেছেন । প্রকৃতিই হল সবচেয়ে বড় শিক্ষক । এই প্রকৃতির অঙ্গনে স্বাধীন বিকাশেই মানুষের সবচেয়ে বড় সার্থকতা ।

এই প্রকৃতি–নির্ভর শিক্ষার ধারণায় মনস্তত্ত্বের যোগ ঘটালেন আঠার শতকের শেষভাগে সুইস্ শিক্ষাবিদ পেস্তালৎসি (১৭৪৬–১৮২৭) । অনাথদের জন্য শিক্ষালয় পরিচালনা করতে গিয়ে পেস্তালৎসি উদঘাটন করলেন শিশু–মনস্তত্ত্বের এক আশ্চর্য জগৎ । শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতাকে অনুসরণ করে তাঁর শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি একই সঙ্গে শিশুর হাত, মস্তিষ্ক আর অনুভূতির বিকাশে উদ্যোগী । পেস্তালৎসির সুযোগ্য শিষ্য জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রেডরিক ফ্রোয়েবেল (১৭৮২–১৮৫২) শিশুর স্বাধীন বিকাশে তার আগ্রহ, ইচ্ছা আর ক্রীড়া প্রবৃত্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেন । এই ধারা অনুসরণ করে শিশুশিক্ষার জন্য কিন্ডারগার্টেন বা 'শিশু–কানন' নামে শিক্ষা পদ্ধতির তিনিই প্রথম প্রবর্তক ।

এই বিশ শতকে পশ্চিমের জগতে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে মার্কিন শিক্ষাবিদ জন ডিউই–র (১৮৫৯–১৯৫২) ভাবধারা । ডিউই শিক্ষা ব্যবস্থায় চলমান জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । শিক্ষা শুধু আগামীকালের জন্য প্রস্তুতি নয়, বর্তমান জীবন–যাপনের কলাও তার আওতাভুক্ত । কাজেই প্রতিটি বর্তমান অভিজ্ঞতাকে অর্থপূর্ণ করে তোলা, সে সব অভিজ্ঞতা থেকে তাৎপর্য আহরণ করাই শিক্ষার লক্ষ্য । তবে এই লক্ষ্য অর্জন সমাজকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়, কেননা ব্যক্তি মানুষকে নিয়েই সমাজ এবং ব্যক্তির সকল অভিজ্ঞতা নির্ভরশীল সমাজ ও পরিবেশের ওপরে । কাজেই জীবনের সঙ্গে, সমাজের ও পরিবেশের সঙ্গে যে শিক্ষার যোগ নেই তা অর্থহীন । শুধু জ্ঞান আর কলাকৌশল আয়ত্ত করাই শিক্ষা নয়, জীবন, পরিবেশ ও সমাজের প্রয়োজনে তাকে নিয়োগ করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ।

বিশ শতকে আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড, বারট্রান্ড রাসেল প্রমুখ দার্শনিকও এমনি অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা, সমাজমুখী, প্রয়োগমুখী শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন । এদেশে এমনি ধরনের শিক্ষা দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথও । শান্তিনিকেতনে শিশুদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তিনি শিক্ষা বিষয়ে নানা পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেছেন আর সেখানে তাঁর শিক্ষাতত্ত্বকে যাচাই করে নিয়েছেন জীবনের কষ্টিপাথরে ।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে দেখেছেন জীবনেরই এক অতি আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হিসেবে । অর্থাৎ জীবনের যা আদর্শ, শিক্ষারও আদর্শ তাই । তিনি বলেছেন, ''শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে । আমরা কী হইব এবং কী শিখিব, এ দু'টি কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন ।" (শিক্ষা, পৃঃ ৭১) । অন্যত্র তিনি বলেছেন, ''অশক্তকে শক্তি দেবার একমাত্র উপায় শিক্ষা; অন্ন, স্বাস্থ্য, শান্তি সমস্তই এরই 'পরে নির্ভর করে ।"

শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে জন ডিউই–র 'কর্মভিত্তিক শিক্ষা' দানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যায় । শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির সাহচর্যে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত তাদের দেহ আর মনকে বিকশিত করে তুলবে — সেই হবে তাদের শিক্ষার ভিত্তি । তাঁর মতে, ''মাটি জল বাতাস আলোর

সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকিলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শীত গ্রীষ্মে কোন কালে আমাদের মুখ ঢাকা থাকে না। তাই আমাদের মুখের চামড়া দেহের চামড়ার চেয়ে বেশি শিক্ষিত, অর্থাৎ বাহিরের সঙ্গে কী করিয়া আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তাহা সে ঠিক জানে।" (*শিক্ষা*, পৃঃ ৮৩)

এক অশান্ত সময়

সক্রেটিস-প্লেটো-অ্যারিস্টটল যে সময়ে তাঁদের শিক্ষাতত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন তার তুলনায় আজকের সময় নিঃসন্দেহে অনেক বদলেছে। রুশো-পেস্তালৎসি-ফ্রোয়বেলের সময়ের চেয়ে প্রকৃতি, পরিবেশ আর সমাজ আজ অনেকাংশে ভিন্নতর। এমন কি ডিউই-হোয়াইটহেড-রবীন্দ্রনাথের কালের চেয়েও আজ আমাদের চারপাশে অনেক দ্রুত গতিতে রূপান্তর ঘটে চলেছে। সময়ের পরিবর্তন যে এসব দার্শনিক ধারণার সব কিছুই তাৎপর্যহীন করে তুলেছে তা নয়, তাঁদের তত্ত্বের অনেক উপাদানই আজও হয়ে রয়েছে কালজয়ী। কিন্তু সেই সঙ্গে এসব তত্ত্বের ব্যাখ্যা আর তার রূপায়ণ নিশ্চয়ই অনেকখানি নির্ভর করবে স্থান-কাল-পাত্রের ওপরে।

এই অশান্ত সময়ের একটি বড় লক্ষণ এই যে, শিক্ষার আদর্শ, লক্ষ্য আর পদ্ধতি নিয়ে আজ প্রশ্ন উঠছে সারা পৃথিবী জুড়ে। প্রশ্ন উঠছে শিক্ষা ব্যবস্থার দক্ষতা নিয়ে, জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সাযুজ্য নিয়েও। বিভিন্ন দেশে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি, কমিশন গঠিত হচ্ছে; তাঁরা দীর্ঘ প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা প্রস্তুত করছেন, কিন্তু সময়ের দ্রুত পরিবর্তনে সে সব বাস্তবায়ন করা হয়ে উঠছে দুঃসাধ্য।

বিগত কয়েক দশকে যে সব ঘটনা শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে তাদের এভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারেঃ

১. বিপুল সংখ্যক দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বিকাশের পথ ধরেছে।

২. জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধারণা বিস্তার লাভ করেছে।

৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব আজ সকল মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

৪. বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে; তার ফলে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে দেখার প্রবণতা বেড়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ায় সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে জনগণের মনে আর্থসামাজিক বিকাশের এবং সেই সঙ্গে শিক্ষালাভের আগ্রহ তীব্র হয়ে উঠেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত সম্পদ এবং শিক্ষার চাহিদার মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠছে। এর ফলে ঔপনিবেশিক কালের সীমাবদ্ধ শিক্ষার সুযোগের ঐতিহ্য ক্রমেই যেন ভেঙে পড়ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতির ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আজ ব্যাপকভাবে তথ্যের আদান-প্রদান সম্ভব হচ্ছে; এমন এর আগে কখনো সম্ভব ছিল না। বিপুল বেগে নতুন জ্ঞানের উদ্ভব ঘটছে। সেসব জ্ঞান ও তার প্রয়োগ ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবী জুড়ে। এর ফলে শুধু যে ক্রমাগত শিক্ষাক্রমের পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে তা নয়, প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে শিক্ষাপদ্ধতি সংক্রান্ত ধারণারও পরিবর্তন। আজ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে নিছক কিছু বিষয়বস্তু শেখা নয়, কি করে ক্রমাগত শিক্ষা গ্রহণ করা যায় সেটা শেখা।

সাম্প্রতিককালে ইউনেস্কোর উদ্যোগে গঠিত এক শিক্ষাবিষয়ক কমিশন একালের কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন এভাবেঃ

১. ইতিহাসে এই প্রথম শিক্ষার অগ্রগতির ফল হিসেবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটতে দেখা যাচ্ছে। জাপান, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা থেকে এমনি ফল প্রকাশ পেয়েছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশ যথেষ্ট অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার করে হলেও এই পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করছে।

২. ইতিহাসে এই প্রথম শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের এমন এক ধরনের সমাজের জন্য প্রস্তুত করার চেষ্টা করছে যা এখনো অনাগত। প্রাচীনকালে দীর্ঘকাল ধরে সমাজের যে স্থিতি দেখা যেত আজ দ্রুত সামাজিক রূপান্তরের ফলে তার অবসান ঘটেছে। এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর অভাবিতপূর্ব চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

৩. ইতিহাসে এই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে উত্তীর্ণ অনেক শিক্ষার্থীকে সমাজ তার প্রয়োজনের জন্য অনুপযোগী বিবেচনা করছে। স্পষ্টতই সমাজের চাহিদা দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না।

বলা বাহুল্য এসব নতুন পরিস্থিতি অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরও তাদের ছাপ ফেলতে আরম্ভ করেছে।

বাংলাদেশে শিক্ষার আদর্শ

একটু আগেই রবীন্দ্রনাথের জবানিতে জানা গেছে একটি জনগোষ্ঠির জীবনের যা আদর্শ তার শিক্ষার আদর্শও তারই অনুসারী। বাংলাদেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনের একটি পরিহাস এই যে, এদেশে আজো কোন সর্বসম্মত জাতীয় আদর্শ দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। বিগত কয়েক দশকে এদেশে বিভিন্ন সময়ে যে সব শাসনতান্ত্রিক

এবং রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে তা থেকেই এই আদর্শগত অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায় । পাকিস্তান যুগের প্রথম দিকে যে ইসলামী জীবন ধারাকে জাতীয় আদর্শরূপে গণ্য করা হয়েছিল, ১৯৫৯ সালের শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন তৈরি হয়েছিল তারই ওপর ভিত্তি করে । আবার বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এদেশের সংবিধানে যে চারটি জাতীয় মূল নীতি গৃহীত হয়, ১৯৭৪ সালের কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন স্বভাবত তারই ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছিল । তারপর বিভিন্ন সময়ে শিক্ষানীতি প্রণয়নের যেসব চেষ্টা হয়েছে প্রধানত জাতীয় আদর্শের অস্পষ্টতার কারণে তার সবই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে ।

এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটার ছ'মাসের মধ্যেই সে সময়ের সরকার একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন । এদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নই ছিল এই কমিশনের প্রধান দায়িত্ব । কমিশন এদেশের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন নিম্নলিখিত বিষয়গুলিঃ

১. *দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব* ঃ এর লক্ষ্য হচ্ছে জাতির ঐতিহ্যে গর্ববোধ সঞ্চার, তার বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কে উৎসাহ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা সৃষ্টি । ... এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা বোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যাতে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে ।

২. *মানবতা ও বিশ্ব-নাগরিকত্ব* ঃ মানুষে মানুষে মৈত্রী, সৌহার্দ্য ও প্রীতি এবং মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে ।

৩. *নৈতিক মূল্যবোধ* ঃ শুধু জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও কৌশল অর্জন নয়, শিক্ষার্থী কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে যেন সর্বদা সততার পথ অনুসরণ করে, চরিত্রবান, নির্লোভ ও পরোপকারী হয়ে ওঠে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে ।

৪. *সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়াররূপে শিক্ষা* ঃ প্রত্যেকটি মানুষ যাতে স্ব স্ব প্রতিভা ও প্রবণতা অনুযায়ী সমাজ জীবন ও ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সৃজনশীল ক্ষমতা নিয়ে অগ্রসর হতে পারে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে ।

৫. *প্রয়োগমুখী ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূল শিক্ষা* ঃ একটি দেশের সকল স্তরের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার আয়োজনের ফলেই জাতীয় সম্পদের ব্যাপক বিকাশ সম্ভব হয়; সে বিকাশকে দ্রুততর করে তোলার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করে তোলা প্রয়োজন ।

৬. *নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলী, সৃজনশীলতা ও গবেষণা* ঃ সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু তথ্য আহরণ নয় — উপলব্ধি, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান প্রভৃতি গুণাবলী বিকাশের ব্যবস্থা থাকবে ।

এই শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হয় নি; একে কার্যকর করারও তেমন কোন উদ্যোগ গৃহীত হয় নি । তবে এই কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী সত্তরের দশকের শেষে প্রাথমিক স্তরে ও আশির দশকের গোড়ায় মাধ্যমিক স্তরে নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তিত হয়। ইতোমধ্যে ১৯৭৯ সালে বেশ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রণীত হয় একটি অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি। তারপরও আরো গোটা কয়েক শিক্ষানীতির কথা শোনা গেছে । এসবের মধ্যে কোন কোনটি সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, কোনটি প্রত্যাখ্যান করেছে জনগণ; আবার কোনটি বা শুধু নথিবন্দী হয়ে আছে ।

শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষা-সংকট

শিক্ষা দর্শনের এই সংকট থেকে এদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে এক সর্বব্যাপী সংকট। মুখে আমরা সর্বজনীন শিক্ষার কথা বলছি, কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে যে হারে শিক্ষার প্রসার ঘটছে তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গেও তাল রাখতে পারছে কিনা সন্দেহ— অর্থাৎ আগামী দিনের বিপুল সংখ্যক নাগরিক স্বাধীনতাপূর্বকালে যে তিমিরে থাকত আজো রয়ে যাচ্ছে সেই তিমিরেই ।

মুখে আমরা জনগণের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কথা বলছি, কিন্তু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার কোন ব্যবস্থা নেই । আমরা বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার কথা বলছি, কিন্তু নানামুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টানাপোড়েনে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়ছে-বই কমছে না । শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ে আমরা কখনো আত্মপ্রসাদ লাভ করছি, কিন্তু হিসেব করে দেখছি না যে, আজো এদেশে শিক্ষার জন্য মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় হয় মাত্র তিন ডলারের মতো — তা আশেপাশের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশেরও কম । এ পরিস্থিতিতে তরুণ সমাজ যদি বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার শিকার হয় তাহলে সেজন্য তাদের ওপরে দোষ চাপানো শক্ত।

মূল প্রশ্নটি তাই আর শুধু শিক্ষার দর্শন বা আদর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না, সমগ্র দেশের আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রশ্নটি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় । মূল জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাবই শিক্ষাক্ষেত্রে নানা অস্পষ্ট চিন্তা ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয় । স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা সমগ্র জনগণের বিকাশকে একটি মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম । এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে একটি প্রধান অবলম্বন হিসেবে দেখা হয়েছে । আজ প্রশ্ন জাগে সে লক্ষ্য আমাদের সামনে আজো আছে কি নেই । সকল আন্তর্জাতিক শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ বলছেন একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ পন্থা হল সেদেশের জনশক্তিকে আগে গড়ে তোলা; আর তাই শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ হল অন্য সকল ক্ষেত্রের চাইতে বেশি ফলপ্রদ । অথচ আমরা মোট দেশজ আয়ের যে অংশ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করছি তা উন্নয়নশীল দেশগুলির আন্তর্জাতিক মানের অর্ধেকেরও কম ।

তাই শিক্ষা কি, কেন আর কার জন্য এ প্রশ্নকে আজ সবার আগে আনা দরকার । এ প্রশ্নের মীমাংসা না করে শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি, উপকরণ এসব সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না । ইংরেজ উপনিবেশবাদীরা সকলের জন্য শিক্ষায় আগ্রহী ছিল না — তাদের শোষণযন্ত্র চালু রাখার জন্য সকলের জন্য শিক্ষা বরং ছিল বিপজ্জনক । পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীরাও সংগত কারণেই সকলের জন্য শিক্ষায় আগ্রহী হয় নি ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দান করা । আমাদের যে শক্তি আছে তারই চরম বিকাশ হবে, আমরা যা হতে পারি তা সম্পূর্ণভাবে হব — তাই হবার কথা শিক্ষার ফল । স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিটি নাগরিকের জন্য এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, দাসত্ব থেকে মুক্তির লক্ষ্য কি আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে আজো প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি ?

এ প্রশ্নের জবাব আমাদের সবাইকে আজ খুঁজতে হবে ।

সর্বজনীন শিক্ষাঃ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ

শিক্ষা মানুষের একটি জন্মগত অধিকার এ সত্য আজ দীর্ঘকাল ধরে স্বীকৃতি লাভ করেছে । মানুষের পূর্ণরূপে মানুষ হয়ে ওঠার একটি প্রধান অবলম্বন হল শিক্ষা; কাজেই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষালাভের সুযোগ প্রতিটি শিশুকেই দিতে হবে — এ প্রশ্ন আজ আর বিতর্কের বিষয় নয় । এই পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ শুরু হয় । প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে জাপানে উনিশ শতকেই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক যে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা এবং ১৯৫৯ সালে যে শিশু–অধিকারের ঘোষণা গৃহীত হয় তাতে প্রতিটি শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকারের কথা বর্ণিত হয়েছে । এই দু'টি ঘোষণাতেই প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে ।

সাম্প্রতিক কালে এ সত্য ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা শুধু যে প্রতিটি শিশুর মানবিক গুণাবলি অর্জনের জন্যই প্রয়োজন তা নয়; বুনিয়াদি শিক্ষা একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্যও একটি আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত । প্রাথমিক শিক্ষা শুধু মানুষকে সাক্ষরতা এবং ভাষা ও গণিতের দক্ষতা দেয় না, সেই সঙ্গে তার বিচারবুদ্ধির বিকাশ ঘটায়; মাঠে–ময়দানে, কল–কারখানায় কর্মীদের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ায়, মানুষকে উদ্যমশীল করে এবং জীবনের নানা মৌলিক চাহিদা — যথা পুষ্টি, আশ্রয়, পোশাক, স্বাস্থ্য এসব মেটাবার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে ।

এই বিশ্বজনীন চেতনার স্বীকৃতি দেখি আমরা ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানেও । এই সংবিধানের ১৭ নং ধারায় বলা হয়েছে "একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা" প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত "সকল বালক–বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের" ব্যবস্থা গৃহীত হবে এবং এই শিক্ষাকে "সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ" করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । সংবিধানের প্রণেতাদের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই অভীষ্টকে বাস্তবে পরিণত করার পন্থা ও কর্মসূচি অতটা সুস্পষ্ট ও সুসাধ্য নয় । এদেশে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের সদিচ্ছা দীর্ঘকাল ধরে ব্যক্ত হয়েছে; কখনো কখনো এ সম্পর্কে কিছু কিছু কর্মসূচিও গৃহীত হয়েছে, কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে একক্ষেত্রে

তেমন অগ্রগতি লাভ করা যায় নি। আজ নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করার সময় পূর্বের এসব কর্মপন্থার মূল্যায়ন এবং সে সবের ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ বাঞ্ছনীয় হবে।

প্রাথমিক নানা উদ্যোগ

এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রথম সংগঠিত উদ্যোগ দেখা যায় ১৯১৯ সালে বেঙ্গল প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট প্রবর্তনের মাধ্যমে। এতে দেশের পৌর এলাকাগুলোতে ৬–১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজনের জন্য 'শিক্ষা সেস' এবং পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু হয়। তবে সে সময় দেশে পৌর এলাকার পরিধি অত্যন্ত সীমিত থাকায় সমগ্র দেশে এই আইনের প্রভাব হয় খুবই সামান্য।

এরপর ১৯৩০ সালে প্রবর্তিত হয় বেঙ্গল (রুরাল) প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট। এই আইনের মাধ্যমে সারা দেশের গ্রামাঞ্চলে ৬–১১ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মোচনের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়। পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সংকল্প ঘোষণা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় নব প্রতিষ্ঠিত জেলা স্কুল বোর্ডের হাতে; তাঁদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নির্দিষ্ট এলাকায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের বিধান রাখা হয়। কিন্তু শিক্ষা সেস-এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের অপ্রতুলতা এক্ষেত্রে অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও বার বার নানাভাবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কথা বলা হয়েছে। ১৯৫১ সালে প্রাদেশিক পরিষদে বেঙ্গল (রুরাল) প্রাইমারি এডুকেশন (ইস্ট বেঙ্গল অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে আবার দশ বছরের মেয়াদে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এজন্য দশ-বছরের একটি 'বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প' হাতে নিয়ে তার সাড়ম্বর উদ্বোধন করা হয় ১৯৫১ সালের ১৬ আগস্ট তারিখে।

দেশে সে সময় ৪০৯টি থানা এবং প্রতি থানায় ১০টি ইউনিয়ন ছিল। স্থির হয় যে, প্রতি বছর প্রতি থানায় একটি করে ইউনিয়ন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নেয়া হবে। সে সব এলাকার স্কুলগুলো জেলা স্কুল বোর্ডের আওতা থেকে সরাসরি সরকারী তত্ত্বাবধানে আসবে। এভাবে ১৯৫১ সালে ৪০২টি এবং ১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে আরো ৩৯০টি ইউনিয়নকে এই প্রকল্পের আওতায় নেয়া হয়। দু'বছরে প্রায় ৫,০০০ স্কুল এবং ১৫,০০০ শিক্ষক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আসে। এজন্য চারটি প্রাথমিক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সময়ে 'কম্পালসরি প্রাইমারি এডুকেশন (সিলেট) অ্যাক্ট' ১৯৫১-এর মাধ্যমে অনুরূপভাবে সিলেট জেলায় নির্বাচিত সার্কেল-এ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে মাত্র দু'বছর চলার পরই এই বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প কার্যত পরিত্যক্ত হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট যে একুশ দফার জনপ্রিয় দাবী নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন তার মধ্যে একটি দাবী ছিল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন। কিন্তু তবু তাঁরা এই শিক্ষা প্রবর্তন করতে পারেন নি; তার নানা কারণ ছিল। প্রধান কারণ হল অর্থনৈতিক। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে অর্থ বরাদ্দের প্রত্যাশা করা হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তার ফলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়, যেমন — বিদ্যালয় গৃহ, শিক্ষা-উপকরণ ইত্যাদির অপ্রতুলতা ; প্রতি স্কুলে পাঁচটি শ্রেণীর জন্য মাত্র তিন জন শিক্ষক; বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়; এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ব্যাপক সুসমন্বিত প্রস্তুতির অভাব।

১৯৫৭ সালে যুক্তফ্রন্টের আমলে দ্য ইস্ট বেঙ্গল (রুরাল) প্রাইমারি এডুকেশন (সাপ্লিমেন্টারি প্রভিশনস্) অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে জেলা স্কুল বোর্ড তুলে দিয়ে প্রাথমিক স্কুলগুলোকে সরকারী তত্ত্বাবধানে নেয়া হয়। বাধ্যতামূলক এলাকার প্রাথমিক স্কুলগুলোকে পরিণত করা হয় 'মডেল' স্কুলে; অন্য স্কুলগুলো হল 'নন-মডেল' স্কুল। অনুরূপ আরেকটি আইনের মাধ্যমে সিলেট জেলাতেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন স্থগিত হয়ে যায়।

বাংলাদেশ – পরবর্তী উদ্যোগ

পাকিস্তান যুগের এক বিপুল বৈষম্যমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে। স্বভাবতই এই আন্দোলনে এক শোষণমুক্ত নতুন সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের স্বপ্ন এবং সকলের জন্য ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রত্যাশা অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিল। তার আগেই ১৯৫৯ সালের জাতীয় শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করে দশ বছরের মধ্যে পাঁচ-বছর মেয়াদী সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে; ১৫ বছরের মধ্যে আট-বছর মেয়াদী বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে। প্রায় এই সময়েই ইউনেস্কোর উদ্যোগে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পনেরটি দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশ-বছর মেয়াদী 'করাচি পরিকল্পনা' প্রণীত হয়। তাতে বলা হয় এই সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলের সব দেশে সাত-বছর মেয়াদী সর্বজনীন শিক্ষা চালু করতে হবে। এই লক্ষ্যে এসব দেশে শিক্ষার জন্য ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়ে মোট দেশজ উৎপাদনের অন্তত ৭ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দের জন্য সুপারিশ করা হয়।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সরকার একটি আইনের মাধ্যমে দেশের তখনকার সব প্রাথমিক স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন; এসব স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকুরিও সরকারীকরণ করা হয়। ১৯৭২ সালে যে প্রথম 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন' গঠিত হয়, সেই কুদরাত-এ-খুদা কমিশন তাঁদের ১৯৭৪ সালের পেশকৃত রিপোর্টে সুপারিশ করেন যে, "প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে পরিগণিত করে তাকে সর্বজনীন করতে হবে।" প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত

প্রচলিত অবৈতনিক শিক্ষা ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে ।

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) প্রস্তাব করলেন ১৯৭৫ সালের মধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ১৯৭৬ সালে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে । পরবর্তী প্রতি বছর এক এক শ্রেণীতে এই বাধ্যতা সম্প্রসারিত হবে । এভাবে ১৯৮০ সালে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এবং ১৯৮৩ সালে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন সম্পন্ন হবে । এজন্য যে সব আনুষঙ্গিক কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয় তার মধ্যে রয়েছেঃ যথেষ্ট শিক্ষক, পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; ১০,০০০ নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা ও ১৫,০০০ স্কুলে দ্বিতীয় শিফ্ট প্রবর্তন; ১০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নয়ন; ২,০০০ মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিফ্ট প্রবর্তন; স্কুলে মেয়েদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি; শিক্ষক–প্রশিক্ষণের জন্য ক্র্যাশ প্রোগ্রাম; প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ব্যাপক সাক্ষরতা কর্মসূচি । বলা বাহুল্য পরবর্তীকালে যে সব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি হয় তার ফলে এসকল প্রস্তাব বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় নি ।

১৯৭৯ সালে যে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয় তাতেও অনুরূপ কর্মসূচির কথা বলা হয়েছিল । এতে প্রস্তাব করা হয় যে, ১৯৭৯ সালে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা এবং পর্যায়ক্রমে ১৯৮৩ সালে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে । এরপর ১৯৮৮ সালে ডঃ মফিজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে প্রণীত বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেও অনেকটা একই ধরনের কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে । তবে এতে বলা হয়েছে ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এবং ২০০০ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে ।

ইতোমধ্যে দশ বছর ধরে প্রস্তুতির শেষে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে 'শিশু অধিকারের সনদ' অনুমোদন করেছেন । তাতে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সব শিশু–কিশোরের জন্য সর্বজনীন শিক্ষার অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে । এছাড়া জাতিসংঘ সম্প্রতি ২০০০ সালের মধ্যে সারা পৃথিবীতে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে । এই লক্ষ্যে ৫–৯ মার্চ ১৯৯০ থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ে বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বাংলাদেশ ১৯৯১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পাচ বছর মেয়াদী সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং গ্রামাঞ্চলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করার ঘোষণা দেয় ।

বাংলাদেশ সরকার ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ তারিখে গেজেটযোগে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক করণ) আইন ১৯৯০ প্রকাশ করেন । এই আইন অনুযায়ী সরকার নির্ধারিত যে কোন তারিখে দেশের যে কোন এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে পারবেন । বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত ইউনিয়ন বা পৌর এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি' নামে একটি কমিটি থাকবে । এই কমিটি ঐ এলাকায় বসবাসরত সব শিশুর একটি তালিকা রাখবে এবং তাদের প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হওয়া এবং নিয়মিত হাজিরা নিশ্চিত করবে । শিশুদের অনুপস্থিতির জন্য অভিভাবকের এবং দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য কমিটির সদস্যদের অর্থদণ্ড দানের বিধানও আইনে রয়েছে । এই আইন ১ জানুয়ারি ১৯৯১ তারিখে সারা দেশে একযোগে চালু হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল । পরে সে সময় পরিবর্তিত করে ১ জানুয়ারি ১৯৯২ তারিখ করা হয়েছে ।

আজকের অবস্থা ও সমস্যা

আশির দশকের গোড়া থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বেশ বড় আকারের কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় । এর ফলে বিগত দশকে এক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতিও হয় । এ সকল উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১৯৮১ সালে পৃথক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । ১৯৮১ সালে একটি প্রাথমিক শিক্ষা আইন এবং ১৯৮৩ সালে সংশোধিত প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তিত হয় । এসব আইনের ধারায় ৪৮২টি উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং প্রতি উপজেলায় ৬–৮ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদ প্রবর্তন করা হয়েছে । এছাড়া প্রতি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি (৮–১০ জন মনোনীত সদস্য) এবং প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে নির্বাহী কমিটির (১১ জন মনোনীত ও নির্বাচিত সদস্য) ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । এই সময়ে প্রাথমিক স্তরের সব শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহেরও ব্যবস্থা করা হয় ।

দ্বিতীয় পাঁচ–সালা পরিকল্পনায় (১৯৮০–৮৫) মোট শিক্ষাখাতের বরাদ্দের মধ্যে প্রায় ৪৭ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল । তৃতীয় পাঁচ–সালা পরিকল্পনাতেও (১৯৮৫–৯০) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অনুরূপ ব্যাপক বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয় । ১৯৮৭ সাল থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাক্রম সংস্কারেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । এসব উদ্যোগের ফলে ১৯৯০ সালে দেখা যায় ৬–১০ বয়ঃক্রমের প্রায় ৭০ শতাংশ ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়গামী (দক্ষিণ এশিয়ার গড় হার প্রায় ৮৫ শতাংশ) এবং প্রতি বছর প্রতি শ্রেণীতে গড় বিদ্যালয় ত্যাগের হার ১৯৮৫ সালের ২২ শতাংশ থেকে কমে ১৩ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে ।

কিন্তু এসব অগ্রগতি সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও যেসব সমস্যা রয়েছে তার পরিমাণ পর্বতপ্রমাণ । দেশে বর্তমানে প্রায় এগার কোটি জনসংখ্যার মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার হার মাত্র ৩০ শতাংশ । সারাদেশে ৬–১০ বছর বয়সী প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার উপযোগী শিশুর সংখ্যা আনুমানিক ১.৬০ কোটি; তার মধ্যে প্রায় ১.২০ কোটি শিশু আজ ৪৬,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করছে । অর্থাৎ প্রায় ৪০ লক্ষ ছেলেমেয়ে আজও স্কুলের বাইরে; তাদের সবাইকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে ।

শুধু যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল তাই নয়, আগামী দিনে বিদ্যালয়ে যাবার উপযোগী শিশুর সংখ্যা আরো বাড়তে থাকবে । জনসংখ্যা প্রতি বছর ২.১ শতাংশ হারে বাড়ছে । এই হারে বাড়লে ১৯৯৫ সালে বিদ্যালয়ের উপযোগী শিশুর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১.৭৮ কোটি । প্রতিটি বিদ্যালয়ে ২৫০ জন শিক্ষার্থী ধরলে এর জন্য মোট ৭১,০০০ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন । অর্থাৎ বর্তমানে যে ৪৬,০০০ বিদ্যালয় আছে তার ওপর আরো ২৫,০০০ বিদ্যালয় প্রয়োজন হবে ।

সেই সঙ্গে প্রয়োজন হবে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষকের । শিক্ষক পিছু ৫০ জন শিক্ষার্থী ধরলে মোট ১.৭৮ কোটি শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন অন্তত ৩.৫৬ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা । তার মধ্যে বর্তমানে রয়েছে মাত্র ১.৯ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা; অর্থাৎ আরো দেড় লক্ষের ওপর শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজন । তাদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে ।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হারে কিছুটা উন্নতি হলেও এখনও অবস্থা রীতিমতো উদ্বেগজনক । সরকারী হিসেবে বলা হয় প্রথম শ্রেণীতে যেসব ছেলেমেয়ে ভর্তি হয় তাদের মধ্যে প্রতি তিন জনে একজন পঞ্চম শ্রেণী শেষ করে; কিন্তু সাম্প্রতিক কোন কোন জরিপে দেখা যায় এই হার প্রতি পাঁচ জনে মাত্র একজন । এমন বিপুল ঝরে পড়ার হার নিয়ে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের স্বপ্ন আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র ।

স্কুলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের হার কম — শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়ে মাত্র ৪৪ শতাংশ । তাছাড়া সচ্ছল পরিবারের মেয়েরা অনেকে স্কুলে গেলেও দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের মধ্যে মাত্র দশ জনে একজন স্কুলে যায় । অবিলম্বে এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন । বিদ্যালয়ে মেয়েদের উপস্থিতির হার বাড়াবার জন্য ক'বছর ধরে শিক্ষক নিয়োগে মেয়েদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে । কিন্তু এখনও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষিকার হার ২০ শতাংশের বেশি নয় । তাতে বোঝা যায় শিক্ষিকাদের হার বাড়াবার জন্য আরো সক্রিয় উদ্যোগের প্রয়োজন । এছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের জন্য তাদের সুষ্ঠু নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের ওপর আরো জোর দিতে হবে ।

বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয়

এটা স্পষ্ট যে, এদেশে বিগত প্রায় সাত দশক ধরে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের যে চেষ্টা চলেছে তা এখনও সফল হয় নি । আজো যে সব বিষয় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপুল সমস্যা সৃষ্টি করছে তার মধ্যে রয়েছেঃ

- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্থানাভাব; অনেক বিদ্যালয়ে পাঁচটি শ্রেণীর জন্য শ্রেণীকক্ষ মাত্র তিনটি ।
- বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ কাঠামো ও অতি অনাকর্ষণীয় পরিবেশ ।

- পাঠ্যপুস্তকের নিম্নমান এবং শিক্ষা উপকরণের গুরুতর অভাব ।
- শিক্ষক স্বল্পতা ও শিক্ষাদানের নিম্নমান ।
- শিক্ষার্থীদের, বিশেষত মেয়েদের, ব্যাপক হারে ঝরে পড়া ।
- দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও তদারকি ব্যবস্থা ।
- শিক্ষা বিষয়ে সামাজিক সচেতনতার অভাব ।

এসব সমস্যার সমাধানের জন্য ইতোপূর্বে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার অনেকগুলোই শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগের অভাবে ব্যর্থ হয়েছে । সাম্প্রতিক কালে সাধারণভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে । কিন্তু এখনও এদেশে শিক্ষার জন্য ব্যয় মোট দেশজ উৎপাদনের মাত্র দু'শতাংশের মতো । এই হার বিশ্ব প্রেক্ষাপটে শুধু নয়, উন্নয়নশীল দেশগুলির গড় হারের চেয়েও অনেক কম । মূলত এই বিনিয়োগের দৈন্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রীহীন দশা এবং অনাকর্ষণীয় পরিবেশের জন্য দায়ী । কাজেই সর্বাগ্রে শিক্ষাখাতে এবং প্রাথমিক শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দ যথাক্রমে মোট দেশজ উৎপাদনের অন্তত চার ভাগ ও দু'ভাগ পর্যায়ে আনা জরুরি প্রয়োজন । সেজন্য বর্তমান বরাদ্দ অন্তত দ্বিগুণ করতে হবে ।

এক্ষেত্রে আর যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হতে পারে সেগুলি হলঃ

- জরিপের মাধ্যমে দু'কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে সব শিশুর জন্য পাঁচ বা ছ'কক্ষবিশিষ্ট বিদ্যালয় স্থাপন নিশ্চিত করা ।
- বিদ্যালয়গুলির ভৌত পরিবেশ উন্নত করে তাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থীর বসার ব্যবস্থা ও যথেষ্ট পরিমাণ পাঠ্যপুস্তক, বোর্ড, চক প্রভৃতি শিক্ষা উপকরণের সরবরাহ ।
- শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপযুক্ত মানের শিক্ষক সরবরাহ ও সেসব শিক্ষকের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ।
- আকর্ষণীয় শিক্ষাক্রম প্রবর্তন এবং তাতে শিশুদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলন, পরিবেশের ওপর গুরুত্ব দান ও আনন্দের উপকরণ সংযোজন ।
- দরিদ্র শিশুদের — বিশেষত মেয়েদের — বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য তাদের স্কুলের পোশাক ও দুপুরে টিফিন সরবরাহ ।
- মহিলাদের আরো ব্যাপক সংখ্যায় শিক্ষকতায় নিয়োগ করে শিক্ষকতায় মহিলাদের হার অন্তত শতকরা ৫০ ভাগে উন্নীত করা ।
- বিভিন্ন বেসরকারী সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামূলক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা ।
- সমগ্র দেশে ব্যাপক সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তন ।

- নানা ধরনের অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষামূলক কর্মসূচি বিস্তারের মাধ্যমে শিক্ষা সহায়ক গণ জাগরণ সৃষ্টি ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষাবিদগণ প্রাথমিক স্তরে মূলত মাতৃভাষা শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে থাকেন । এদেশে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন এবং অন্যান্য শিক্ষা কমিশনও প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া আর কোন ভাষা শিক্ষাদানের বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন । কিন্তু বর্তমানে বাংলা ছাড়াও বিদেশী ভাষা ইংরেজি এবং ধর্মীয় ভাষা আরবি, সংস্কৃত প্রভৃতির বোঝা কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধিবৃত্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে । ভাষার এই বোঝা কমানো সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থেই আজ একান্ত জরুরি প্রয়োজন ।

বাংলাদেশের সংবিধানে যে "একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন" শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল তা থেকে বহু দূরে সরে এসে আমরা আজ এক বিচিত্র ত্রিমুখী শিক্ষার ধারা সৃষ্টি করেছি । প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরনের ত্রিমুখী শিক্ষা এদেশের জনগণের ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের অনুকূল বলে বিবেচনা করা যায় না । কাজেই প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাসূচিতে অবিলম্বে সামঞ্জস্য আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন ।

জাতিসংঘ যে শিশু অধিকারের সনদ গ্রহণ করেছে তাতে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সব নাগরিকের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে । দু'হাজার সালের মধ্যে 'সকলের জন্য শিক্ষা'-র যে কর্মসূচি সম্প্রতি জাতিসংঘের উদ্যোগে গৃহীত হয়েছে তাতে সবার জন্য ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বুনিয়াদি শিক্ষা এই সময়ের মধ্যে নিশ্চিত করার কথা । বাংলাদেশে যদি আমরা ২০০০ সালের মধ্যে ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা' নিশ্চিত করতে না পারি তাহলে বিশ্ব-সমাজের কাছে আমাদের লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না । বিদ্যমান গভীর আর্থ— সামাজিক পশ্চাদপদতা কাটিয়ে উঠে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সমৃদ্ধির পথে এগোবার জন্যই এই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিতে সাফল্য অর্জন আজ আমাদের একটি জরুরি জাতীয় কর্তব্য হয়ে উঠেছে ।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এত জরুরি কেন

জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে আজ প্রায় সাড়ে পাঁচশ কোটি মানুষের মধ্যে পনের বছরের বেশি বয়সীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি, তার মধ্যে প্রায় একশ কোটিই আজো নিরক্ষর । এই নিরক্ষরদের মধ্যে আবার অর্ধেকের বাস বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে । পৃথিবীতে নিরক্ষরদের সংখ্যায় যেমন তারতম্য রয়েছে দেশে দেশে, তেমনি তারতম্য রয়েছে রয়েছে নারী-পুরুষভেদে । গড়পড়তা হিসেবে পুরুষদের মধ্যে যেখানে প্রতি পাঁচজনে একজন নিরক্ষর, সেখানে মেয়েদের মধ্যে নিরক্ষর তিনজনে একজন ।

দুনিয়া জুড়ে এমনি ব্যাপক নিরক্ষরতার মুখে জাতিসংঘ ১৯৯০ সালকে ঘোষণা করেছিল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ বলে । এ বছরই মার্চ মাসে জাতিসংঘের উদ্যোগে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়েছে দু'হাজার সালের মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে সকলের জন্য শিক্ষা প্রবর্তনের সংকল্প ।

সমস্যাটা যে অতি জরুরি তাতে কোন সন্দেহ নেই । নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ওপর শিক্ষার রয়েছে ব্যাপক প্রভাব । অথচ আজ সারা পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিরক্ষর আর শিক্ষাবঞ্চিত থাকার ফলে অনেক দেশেই দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়ে উঠছে দুঃসাধ্য।

বিশ শতকের শেষে মানুষ আজ সভ্যতা এবং জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে বিপুলভাবে এগিয়েছে । কিন্তু আজকের এই পৃথিবীতেও অন্তত একশ কোটি লোক রয়েছে দারিদ্রসীমার নিচে, দেড়শ কোটি লোক আজো প্রায় কোন রকম চিকিৎসার সুযোগ পায় না, একশ কোটির বেশি লোক বাস করে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে । তার চেয়েও বড় কথা হল যে-সব লোক নিরক্ষর, শিক্ষাহীন তারাই দেখা যায় সবচেয়ে গরিব, সবচেয়ে বেশি দুর্গতির শিকার। অশিক্ষা যেন হাত ধরাধরি করে চলে অপুষ্টি, অস্বাস্থ্য আর দুঃখদুর্দশার সঙ্গে ।

বিশ্বজনীন অধিকার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হবার মাত্র অল্পদিনের মধ্যেই ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ তারিখে গৃহীত হয় মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা । এই ঘোষণায় মানুষের আরো নানা মৌলিক অধিকারের মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা, নারী-পুরুষ বা

সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে বুনিয়াদি শিক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে । এই ঘোষণার ২৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

১. প্রতিটি মানুষের শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। অন্তত প্রাথমিক ও বুনিয়াদি স্তরে শিক্ষা হবে অবৈতনিক । প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক.

২. শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানবিক গুণাবলি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করা এবং মানবাধিকার ও মৌল স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করে তোলা । .

৩. সন্তানকে কি ধরনের শিক্ষা দেয়া হবে তা বেছে নেবার অধিকার পিতামাতার থাকবে ।

এরপর জাতিসংঘ ২০ নভেম্বর ১৯৫৯ সালে গ্রহণ করে শিশু অধিকারের ঘোষণা । এই ঘোষণাতেও সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ২০ নভেম্বর ১৯৮৯ তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত শিশু অধিকারের সনদে । এই সনদ ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে সারা পৃথিবীতে কার্যকর হয়েছে । এই সনদে শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ২৮)ঃ

১. অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ প্রতিটি শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকার স্বীকার করছে এবং সমঅধিকারের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে এই অধিকার কার্যকর করার জন্য তারা (ক) প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং সবার জন্য বিনা বেতনে লভ্য করবে;

২. অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা শিশুদের মানবিক মর্যাদা বজায় রেখে কার্যকর করা হয় ।

৩. অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ সারা পৃথিবী থেকে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূর করার জন্য এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্তার ও উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রসারিত করবে। এক্ষেত্রে বিকাশশীল দেশগুলির প্রয়োজনের দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি দেয়া হবে ।

বলাই বাহুল্য যে, জাতিসংঘ এবং বিশেষ করে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) বিগত কয়েক দশক ধরে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং সাক্ষরতা বিস্তারের ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ।

কি ও কেন ?

শিক্ষা যে প্রতিটি মানুষের একটি জন্মগত অধিকার এ ধারণা আজ সারা বিশ্বে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের একটি পার্থক্য এই যে, অন্য প্রাণীরা তাদের চরিত্রগত গুণাগুণ মূলত জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সহজাতভাবে অর্জন করে কিন্তু মানুষ তার মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে তার চারপাশের পরিবেশ ও সমাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে । এককালে এই শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়া ছিল প্রধানত অনানুষ্ঠানিক, কিন্তু মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় গুণাবলি এবং অর্জনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার জটিলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার ফলে ক্রমে ক্রমে উদ্ভব ঘটেছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার । আজ দেখা যাচ্ছে যেসব দেশে শিক্ষার মান সবচেয়ে নিচে সেসব দেশেই জনগণের জীবনযাত্রার মানও সবচেয়ে নিচে । এ সত্য আজ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, জনগণের দারিদ্র্য দূর করে নিম্নতম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে হলে সব মানুষকে সাক্ষরতা ও মৌলিক শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ছাড়া এটা সম্ভব নয় ।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বলতে স্বভাবতই বোঝায় যে, তা দেশের প্রতিটি ছেলেমেয়ের জন্য প্রযোজ্য হবে । আজকের জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে প্রতিটি মানুষ যদি একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন না করে তাহলে সমগ্র সমাজের অগ্রগতিই ব্যাহত হয় । এই বুনিয়াদি শিক্ষা বলতে সচরাচর ধরা হয় কিছু মৌলিক ভাষাজ্ঞান এবং গণিত সাক্ষরতা। ভাষাজ্ঞানের মধ্যে পড়ে নিজের মাতৃভাষায় পড়তে পারা, লিখতে পারা এবং নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারা । দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবপত্র রাখার দক্ষতা পড়ে গণিত সাক্ষরতার মধ্যে । কিন্তু এসবের সঙ্গে যোগ করতে হবে নিজের পরিবেশকে জানা, বোঝা এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারার দক্ষতা, চিন্তাশক্তির বিকাশ, দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সে সবের সমাধানের কৌশল, নৈতিকতার বোধ এবং মানবিক গুণাবলি অর্জন । এ সবই একজন শিশুকে বাস্তব জীবনের মুখোমুখি হতে অথবা উচ্চতর শিক্ষা বা কারিগরি দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে ।

প্রাথমিক শিক্ষার কালপরিধি নিয়ে নানা দেশে বেশ কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে । সাধারণত অধিকাংশ দেশে ছ'বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষার শুরু ধরা হয় এবং দেশভেদে সচরাচর পাঁচ থেকে আট বছর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি । আমাদের দেশে পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর, তবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৯৭৪ সালের কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন থেকে ১৯৮৮ সালের মফিজউদ্দীন আহমদ শিক্ষা কমিশন পর্যন্ত এদেশের সকল বিশেষজ্ঞ দলই পর্যায়ক্রমে আট বছর মেয়াদী সর্বজনীন, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন । জাতিসংঘের উদ্যোগে 'সবার জন্য শিক্ষা' এই মূলমন্ত্র নিয়ে ৫-৯ মার্চ ১৯৯০ থাইল্যান্ডে যে আন্তর্জাতিক উচ্চপর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে সারা পৃথিবীতে ২০০০ সালের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সব ছেলেমেয়ের অন্তত ৮০ শতাংশকে সর্বজনীন বুনিয়াদি শিক্ষার আওতায় আনবার সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে ।

বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব সম্পর্কে আজ যে বিশ্বজনীন চেতনা গড়ে উঠেছে তার প্রতিফলন দেখি ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানেও । এই সংবিধানের ১৭ নং ধারায় বলা হয়েছে একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা

ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গৃহীত হবে এবং সে শিক্ষাকে "সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ" করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । সংবিধানের প্রণেতাদের নির্দেশ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে দীর্ঘকাল ধরে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের সদিচ্ছা ব্যক্ত হলেও এযাবৎ এক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি লাভ হয় নি ।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আজ আর শুধু একটি শ্লোগান মাত্র নয়, এর সঙ্গে জড়িত আমাদের সমগ্র আর্থসামাজিক বিকাশ, এমন কি আমাদের বেঁচে থাকার প্রশ্ন । সকল বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে দেশে দ্রুত এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে এদেশের দুর্গতি বাড়তেই থাকবে ।

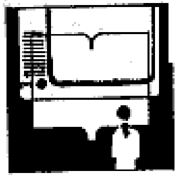

টেলিভিশন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান

কর্মক্লান্ত দিনের শেষে যখন আমরা আয়েশ করে টেলিভিশন সেটটির সামনে বসি তখন তা থেকে প্রথমেই যা চাই সে হল নির্মল আনন্দ। একথাটা বোধ করি ছেলে-বুড়ো-যুবা, নর-নারী, শহর বা গ্রামের বাসিন্দা-নির্বিশেষে মোটামুটি সবার বেলাতেই প্রযোজ্য ।

আর আসলেও আমাদের দেশে টেলিভিশনের মূল লক্ষ্য হল আনন্দ দেয়া — মানুষের অবসরের, বিনোদনের সঙ্গী হওয়া । আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশন দেয় দেশ-বিদেশের খবর — দ্রুত, তাৎক্ষণিক, চাক্ষুষ বিবরণ দিয়ে — যেন অকুস্থলে গিয়ে আমরা দেখছি ঘটনাটি ঘটতে । কখনো টেলিভিশন দেয় চমক — নানা অগম্য স্থানের অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়, অভিনব দৃশ্যের অবতারণা করে ।

সেই সঙ্গে টেলিভিশন আমাদের শিক্ষাও দেয় । এই শিক্ষা কখনো সচেতন — প্রত্যক্ষ; তবে বেশির ভাগই পরোক্ষ । সচেতন শিক্ষার জন্য রয়েছে নানা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান; তার মধ্যে যেমন পড়ে 'শিক্ষাঙ্গন' জাতীয় অনুষ্ঠানে সরাসরি শ্রেণীকক্ষকে টেলিপর্দার মাধ্যমে আমাদের ঘরে নিয়ে আসা, তেমনি পড়ে সঙ্গীত শিক্ষা, খেলাধুলো শিক্ষা, কৃষি-স্বাস্থ্য-শিল্প-ধর্ম-ঘরকন্না ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা ।

তবে টেলিভিশনের আরো বড় রকম একটা শিক্ষামূলক ভূমিকা রয়েছে — যেটা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ । বলা যেতে পারে অনানুষ্ঠানিক । নানা দেশ-বিদেশের দৃশ্য টিভির পর্দায় দেখে আমরা সে সব দেশের বিষয়ে জানতে পারি । সেটা হতে পারে খবর থেকে, চলচ্চিত্র থেকে বা বিনোদনমূলক সঙ্গীত, খেলাধুলো বা এমনি আর কোন অনুষ্ঠান থেকে । টেলিভিশনের নাটক, খবর এসব আমাদের সামনে তুলে ধরে আমাদের সমাজের বাস্তবতা — কখনো যথার্থভাবে, কখনো বা রঙিন চশমার ভেতর দিয়ে । টেলিভিশন আমাদের সংবেদনশীলতা, সুকুমার বৃত্তি, মানবিক মূল্যবোধ এসবও শেখায়; দেশ-বিদেশের মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়; প্রকৃতি ও পরিবেশের নানা রহস্য, নানা সমস্যার সঙ্গেও আমাদের পরিচিত করায় ।

টেলিভিশন ও শিক্ষা

টেলিভিশনের নিয়মিত সম্প্রচার পশ্চিমের জগতে শুরু হয়েছিল এই শতকের ত্রিশের দশকের শেষে — কিন্তু তার ব্যাপক বিস্তার ঘটে মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই । পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও টেলিভিশন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে । আর সেই প্রথম থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে টেলিভিশনের বিপুল

সম্ভাবনার দিকে সবার দৃষ্টি পড়ে । পঞ্চাশের দশকে আমেরিকায় স্কুলের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । ষাটের দশকে ভারত প্রভৃতি উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষামূলক টেলিভিশন অনুষ্ঠানের বড় আকারের প্রকল্প হাতে নেয়া হয় ।

আমাদের দেশেও (তৎকালীন পাকিস্তানে) ব্যয়বহুল টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থা চালু করার একটি বড় যুক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছিল এর শিক্ষামূলক ব্যবহারকে । এদেশে ১৯৬৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হবার পরপরই পাকিস্তান সরকার আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আর্থার হাঙ্গারফোর্ড নামে একজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে টেলিভিশনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের একটি বিস্তারিত প্রকল্প প্রণয়ন করেন। অবশ্য তার পরপরই রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হওয়ায় এটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয় নি ।

টেলিভিশনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের বিশেষ কতকগুলো সুবিধে আছে । বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সারাদেশে উচ্চমানের শিক্ষক সরবরাহ করা দুঃসাধ্য । সেক্ষেত্রে বাছাই করা কিছু শিক্ষককে দিয়ে আদর্শ পাঠ তৈরি করে টেলিভিশনে সারা দেশে প্রচার করা যায় । এতে দেশের নানা অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা যেমন সেই শিক্ষকের পাঠ থেকে সহজে শিখতে পারে, তেমনি অন্য শিক্ষকরাও এমনি আদর্শ পাঠ দেখে তাঁদের শিক্ষাদানের মানকে উন্নত করতে পারেন । টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে নানা দেশের দৃশ্য, নানা ধরনের ঘটনা, জটিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, যা সব বিদ্যালয়ে দেখানো সম্ভব নয়, তাও দেখানো সম্ভব হয় । দূরবীন দিয়ে দেখা বহুদূর মহাকাশের দৃশ্য, অথবা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা সাধারণ দৃষ্টির অগোচর অতিছোটর জগতের দৃশ্য টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে দেখানো সম্ভব। অতি অল্প সময়ে ঘটে গেছে এমন ঘটনা ধীরলয়ে দেখানো, অথবা দীর্ঘস্থায়ী ঘটনার দৃশ্য অপেক্ষাকৃত দ্রুতলয়ে অল্প সময়ে দেখানো—এসব ক্যামেরার কৌশল ব্যবহার করে টেলিভিশনের অনুষ্ঠানকে শ্রেণীকক্ষের পাঠের চাইতে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলা যায় ।

আর সবচেয়ে বড় কথা হল টেলিভিশন পর্দার দুর্নিবার আকর্ষণ দর্শকদের শিক্ষার আগ্রহ বহুগুণে বাড়িয়ে তুলতে পারে— বিশেষ করে সে শিক্ষার সঙ্গে যদি যথাযথভাবে আনন্দের সংমিশ্রণ ঘটানো যায় । অবশ্য এ ধরনের সার্থক অনুষ্ঠান তৈরি খুব সহজ নয় । আর ভাল শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ব্যয়সাধ্যও বটে । তবে সমগ্র দেশের শিক্ষার চাহিদা এবং জনমনে টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের বিপুল সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করলে হয়তো দেখা যাবে শিক্ষার নানা প্রচলিত মাধ্যমের তুলনায় টেলিভিশন–মাধ্যমের শিক্ষা আসলে তেমন ব্যয়বহুল নয় ।

বাংলাদেশে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান

গত সিকি শতাব্দীতে ডি.আই.টি. ভবনের সেই অপ্রশস্ত পরিসর থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশন আজ অনেক দূর এগিয়ে এসেছে । নানা ধরনের দেশী–বিদেশী শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানও এই সময়ে প্রচারিত হয়েছে ।

আমার নিজের টেলিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় একেবারে গোড়া থেকে। সেকালে অনুষ্ঠান আগে রেকর্ড করার কোন ব্যবস্থা ছিল না । তাই আলোচনায় এলোমেলো বা বেয়াড়া কিছু বলে ফেললে সেটা আর ফেরানো যেত না। তাছাড়া স্টুডিওর তীব্র আলোয় ছোট ঘরটি খুব সহজেই গুমোট হয়ে উঠত । ছোটদের ও বড়দের জন্য 'বিজ্ঞান–বিচিত্রা' জাতীয় অনেক অনুষ্ঠান করবার সুযোগ হয়েছে । তার মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ে ২১ জুলাই ১৯৬৯ তারিখে মানুষের চাঁদে প্রথম পদার্পণ উপলক্ষে টেলিভিশনের ধারাভাষ্যের বিশেষ অনুষ্ঠানটি । কিছু ফিল্ম এবং কিছু আলোচনা —কখনো একসঙ্গে, কখনো পৃথকভাবে —পর্যায়ক্রমে চলেছিল এক ঘন্টা ধরে । ডঃ মুহাম্মাদ কুদরাত–এ–খুদা এবং আরো দু'একজনের এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়াও নেয়া হয়েছিল সাক্ষাৎকার আকারে । স্বভাবতই অনুষ্ঠানটি বেশ উত্তেজনাকর মনে হয়েছিল ।

আমাদের এখানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষামূলক যেসব অনুষ্ঠান চলেছে তার মধ্যে 'শিক্ষাঙ্গন' (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের), 'শিক্ষা–বিচিত্রা' এসব দীর্ঘকাল ধরে চলেছে — শিক্ষাঙ্গন এখনো চলছে । এছাড়া শিশুদের জন্য অপেক্ষাকৃত অনানুষ্ঠানিক 'ক খ', 'অক্ষর চক্কর' এসব অনুষ্ঠানও বেশ দাগ কেটেছিল । বিজ্ঞানবিষয়ক অনুষ্ঠানের মধ্যে বিজ্ঞান–বিচিত্রা, অন্বেষা, অণু–পরমাণু, নতুন দিগন্ত, বিন্দু থেকে সিন্ধু এসব অনুষ্ঠানের নাম করা যেতে পারে । তাছাড়া জ্ঞান–জিজ্ঞাসা, মাটি ও মানুষ, আপনার স্বাস্থ্য এগুলিও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের পর্যায়ে পড়ে ।

গত পঁচিশ বছরে বিদেশের বেশ কিছু ভাল শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান আমাদের টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে । এর মধ্যে কিছু আছে সাধারণ শিক্ষামূলক — যেমন সিসেমি স্ট্রীট (Sesame Street), ইলেকট্রিক কোম্পানি (Electric Company), এ টু জু (A to Zoo) ও ডিসকভারি (Discovery) । 'সিসেমি স্ট্রীট' ছোট শিশুদের জন্য একটি বিনোদন–সহযোগে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান । আশ্চর্যরকম জীবন্ত 'পাপেট' এবং জীবন্ত অভিনেতা–অভিনেত্রীর সমন্বয়ে তৈরি এই সিরিজটি পৃথিবীর বহুদেশে দীর্ঘকাল ধরে চলেছে ।

'লাইফ অন আর্থ' নামে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ও বৈচিত্র্য নিয়ে যে আকর্ষণীয় সিরিজটি ডেভিড অ্যাটেনবরো তৈরি করেছিলেন সেজন্য তিনি ইউনেস্কোর কলিঙ্গ পুরস্কারসহ নানা আন্তর্জাতিক পুরস্কারে সম্মানিত হন । বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কার্ল সাগান কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'বছরের ছুটি নিয়ে মহাবিশ্বের বিকাশ ও নানা বিস্ময়কর রহস্য নিয়ে 'কসমস' সিরিজের তেরটি ছবি তৈরি করেন । এতে বিজ্ঞান, নাটক ও সাহিত্যের তিনি চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়েছেন ।

টিভির কিছু সীমাবদ্ধতা

টেলিভিশনের যে বিশেষ আকর্ষণ ও মোহনীয়তা তাই আবার শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের জন্য কিছু সীমাবদ্ধতাও সৃষ্টি করে। টেলিভিশন শুধু বসে বসে দেখতে হয় বলে অনেকে

মনে করেন এতে এক ধরনের মানসিক অলসতা এবং কর্মবিমুখতা সৃষ্টি হয় । বিশেষ করে বিনোদনের দিকে টেলিভিশন কর্মকর্তাদের (প্রায়ই দর্শকদেরও) নজর বেশি থাকায় অনুষ্ঠানের শিক্ষামূলক দিকটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না ।

আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির একটি সমস্যা হল এগুলি ঠিক বিদ্যালয়ের বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষের সঙ্গে সমন্বিত করে তোলা আমাদের দেশে এখনও সম্ভব হয় না। হয়তো বিদ্যালয়ে শিক্ষক এক বিষয় নিয়ে পড়াচ্ছেন, অথচ টিভিতে সে সময়ে প্রচার করা হচ্ছে অন্য বিষয়ের বা প্রসঙ্গের পাঠ । বিদেশে শ্রেণীকক্ষের জন্য বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা আছে (যেমন ক্লোজড্ সার্কিট টিভি, কেব্‌ল্ টিভি, পে টিভি ইত্যাদি) । শ্রেণীকক্ষের জন্য বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠানমালা ভিডিও রেকর্ড করে ভিসিআর-এর মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারলে এ সমস্যার একটা সুরাহা হতে পারে । এধরনের ভিডিও শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বসেও দেখতে পারে ।

বিদেশী অনুষ্ঠান দেখাবার একটি সমস্যা হল সে সব অনুষ্ঠান আমাদের পরিবেশ, ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে যেমন সেগুলো বুঝতে অসুবিধে হতে পারে তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বিজাতীয় প্রভাবের বিপদও থেকে যায় । এজন্য এধরনের অনুষ্ঠান বেশ সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন করা প্রয়োজন । এ সমস্যার সমাধান মূলত আমাদের দেশের উপযোগী এধরনের নিজস্ব অনুষ্ঠানমালা তৈরির মধ্য দিয়েই কেবল হতে পারে ।

টিভির আরেকটি সমস্যা — যা দেশী-বিদেশী দু'ধরনের অনুষ্ঠান সম্পর্কেই প্রযোজ্য — সে হল দর্শক-শ্রোতাদের বাস্তববিমুখ কল্পলোকের দিকে ধাবিত করা । এ সমস্যা অবশ্য আমাদের চলচ্চিত্র, সাহিত্য, সঙ্গীত এবং অন্যান্য সংস্কৃতিমাধ্যম সম্পর্কেও কম-বেশি প্রযোজ্য । এক্ষেত্রে টিভির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও ব্যাপক জনসমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং পর্যালোচনা-সমালোচনা-আত্মসমালোচনাই প্রধান রক্ষাকবচ হতে পারে । টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান যাতে এদেশের মানুষের বাস্তব চাহিদা মেটাতে পারে, তাদের শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিগত বিকাশে সহায়তা করতে পারে — এটা সবারই সমান দায়িত্ব; এবং সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন হলেই এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন সম্ভব ।

সবশেষে বলতে হয় টেলিভিশনের নেশাও অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকদের জন্য বেশ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় । টিভির নেশা যেমন বয়স্কদের অবসর কাটাবার উপকরণ হতে পারে, তেমনি হতে পারে শিক্ষার্থীদের বই পড়ার প্রতিবন্ধক । এটাই মনে করিয়ে দেয় যে, টিভি মূলত একটি মাধ্যম মাত্র — এবং অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম । এই মাধ্যমটি যাতে গঠনমূলক ও সদর্থক কাজে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যায় সেজন্য যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও সক্রিয় কর্মোদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে ।

সবার জন্য বিজ্ঞান

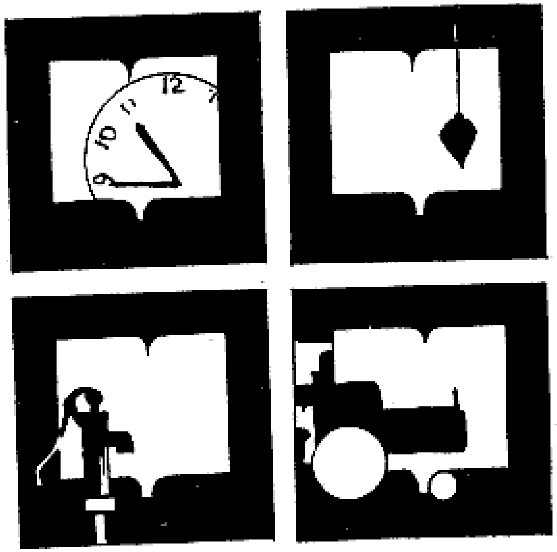

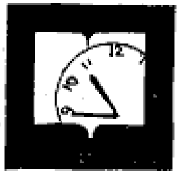

বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা

গত তিনশ বছরে সারা পৃথিবীর মানচিত্রে বিরাট রকম পরিবর্তন ঘটেছে। অধিকাংশ দেশে মানুষের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বিপুল পরিমাণে বেড়েছে । মানুষের জীবনযাত্রার এই বৈপ্লবিক রূপান্তরে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে বিজ্ঞান ও তার সহযাত্রী প্রযুক্তিবিদ্যা । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আজ যে কোন দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তিরূপে গণ্য হয়ে থাকে । আর ঠিক এ কারণেই পৃথিবীতে সব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশিক্ষা বিরাট গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে ।

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য একদিকে যেমন প্রকৃতির নানা অজানা রহস্য উন্মোচন, অন্যদিকে তেমনি এই লব্ধ জ্ঞানকে সমগ্র জনসমাজের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে কাজে লাগানো । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে আমরা যেমন সাধারণভাবে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্য অগ্রসর দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছি, তেমনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা বা এক্ষেত্রে কোন শক্তিশালী ঐতিহ্যও আজো সৃষ্টি করতে পারি নি । এ পরিস্থিতি দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পথে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

বর্তমান পরিস্থিতির একটি প্রধান কারণ হল এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য । বাংলাদেশ বা এককালে ব্রিটিশ শাসনাধীন এই উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা স্পষ্টতই স্বাধীন দেশের উপযোগী করে তৈরি হয় নি । ঔপনিবেশিক শাসকরা মূলত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে একটি শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন — আর সেজন্য সাধারণ মানবিক শিক্ষাই ছিল যথেষ্ট । ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন সত্তা নিয়ে আবির্ভূত হল এক দুর্বল অর্থনৈতিক ভিতের ওপর, আর সেসময়ে মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দেখা দিল অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র জনগণের জীবনে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি। এ পরিস্থিতিতে দেশের কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, নির্মাণ, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, পরিবহন প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন হয়ে উঠল অতি জরুরি ।

দেশের দ্রুত উন্নয়নের এ দাবী শিক্ষা ক্ষেত্রে তার ছাপ ফেলতে বাধ্য । শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হলে সে দুর্বলতা প্রতিফলিত হয় অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক

সকল ক্ষেত্রে । তাই কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের ব্যাপক আয়োজন ছাড়া আর কোন ধরনের উন্নয়ন সার্থক হওয়া সম্ভব নয় । এদেশের আগামী দিনের নাগরিক ও স্রষ্টা তরুণ শিক্ষার্থী সমাজ। তাদের মধ্যে যথাযথ উন্নয়নমুখী মনোভঙ্গি গড়ে তোলা এবং দেশের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান

পঞ্চাশের দশকের আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞানের তেমন কোন স্থান ছিল না—শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে 'প্রকৃতি পাঠ' নামে বিজ্ঞানের কিছু প্রাথমিক জ্ঞান দান করা হত । ১৯৫১ সাল থেকে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে সাধারণ বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হয়; ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতেও পাঠ্য হল বিজ্ঞানের কিছু প্রাথমিক ধারণা । এছাড়া অল্প কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে মৌলিক বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থা চলল এক দশক ধরে । এ পর্যায়ে বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় বিজ্ঞান অবশ্যপাঠ্য ছিল না বলে আগের শ্রেণীগুলিতেও বিজ্ঞান একেবারেই নামমাত্র পড়ানো হত ।

১৯৬১ সালে যে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হল তাতে অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন ঘটল। এই শিক্ষাক্রমে নবম–দশম শ্রেণীতে সাধারণ বিজ্ঞান অবশ্যপাঠ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেল । কোন কোন বিদ্যালয়ে নৈর্বাচনিক বহুমুখী শিক্ষাক্রম হিসেবে বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য, কারুশিল্প, গার্হস্থ্য অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় চালু হল । যারা বিজ্ঞান, কৃষি, কারুশিল্প, গার্হস্থ্য অর্থনীতি প্রভৃতি শিক্ষাক্রম গ্রহণ করল তাদের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত প্রভৃতি নৈর্বাচনিক বিষয় নিতে হত । আর যারা মানবিক বা বাণিজ্য বিভাগে যেত তাদের নিতে হত আবশ্যিক 'সাধারণ বিজ্ঞান' । দীর্ঘ দু'দশক ধরে অর্থাৎ আশির দশকের শুরু পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরে এই বহুমুখী শিক্ষাক্রম চালু ছিল ।

দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় দশ শতাংশ আজ মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করে। এসব মাদ্রাসার শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞানের স্থান সাধারণ বিদ্যালয়ের তুলনায় নিম্নমানের। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণীতে এবং ১৯৬২ সাল থেকে আলিম স্তরে (১১–১২ শ্রেণী) ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে (সাধারণ বিজ্ঞান, ইংরেজি, উর্দু ও ফার্সির মধ্যে যে কোন দু'টি বিষয়) বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হলেও তার পাঠ্যসূচি সাধারণ বিদ্যালয়ের সমপর্যায়ের বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচির চেয়ে অনেক নিচুস্তরের ছিল । ১৯৭৫ সাল থেকে কিছুটা সাধারণ বিজ্ঞান মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণী থেকে চালু হয় এবং পরবর্তী বছর থেকে সাধারণ বিদ্যালয়ের নবম–দশম শ্রেণীর 'সাধারণ বিজ্ঞান' আলিম স্তরের জন্য পাঠ্য করা হয় । অবশেষে ১৯৮৩ সাল থেকে দাখিল স্তরে (নবম–দশম শ্রেণী) এবং ১৯৮৫ সালে আলিম স্তরে (১১–১২ শ্রেণী) অল্প সংখ্যক মাদ্রাসায় সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ ঐচ্ছিক বিজ্ঞান বিষয় চালু হয়েছে (প্রায় পাঁচ হাজার মাদ্রাসার মধ্যে আট শতাংশের মতো) । তবে আশা করা যায় আগামীতে মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষার মান ক্রমাগত উন্নত হবে এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের মানের কাছাকাছি পৌঁছবে।

শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন

বিভিন্ন স্তরে আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতি ও পরিবেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এরকম একটি অভিযোগ প্রায়ই ওঠে । অভিযোগটি পুরনো। বিজ্ঞানচর্চার মূল কথাই হল অনুসন্ধান ও পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃতির সত্য উদঘাটন করতে শেখা । কাজেই বিদ্যালয়ে অনুসন্ধানমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না থাকলে বিজ্ঞান শিক্ষা সার্থক হওয়া শক্ত । এছাড়া শিক্ষালাভ শুধু বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে ঘটে না; বিদ্যালয়ের বাইরের বাস্তব জীবনের নানা শিক্ষা–সহায়ক উপকরণ বিজ্ঞান শিক্ষার কাজে ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন ।

কিন্তু এদেশে সত্তরের দশকের আগে পর্যন্ত এধরনের উদ্যোগ তেমন দেখা যায় নি। শিক্ষার্থীর জীবনের পরিবেশও যে পরীক্ষা–নিরীক্ষায় গবেষণাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে স্থানীয় উপকরণ ও অভিজ্ঞতাকে শিক্ষাদানের অঙ্গীভূত করার চেষ্টাও তেমন হয় নি ।

ইতোমধ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সকল স্তরেই শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়ে চলেছে; তেমনি বেড়েছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে শেখার আগ্রহ ও কৌতূহল । কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে পাঠ্যসূচি থেকেছে অপরিবর্তিত । ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (ডঃ কুদরাত–এ–খুদা কমিশন নামে পরিচিত) তাই বললেন,

> বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে আমাদের অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক সেকেলে হয়ে পড়েছে । আমাদের বিজ্ঞানের কোর্সে নতুন ভাবধারা প্রবর্তন অত্যাবশ্যক । মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব স্তরে বিজ্ঞান সিলেবাসকে বিশেষভাবে উন্নীত করতে হবে যাতে অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীর উন্নত দেশের মানের সমকক্ষতা অর্জন করা যায় । (পৃঃ ১০৯)

শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে একটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি নিয়োগ করা হয়; এই কমিটি ১৯৭৫–৭৮ সালে বিভিন্ন বিষয়ে নতুন পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করেন । নতুন পাঠ্যসূচি ১৯৭৮ সালের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে, ১৯৭৯ সালে চতুর্থ–পঞ্চম শ্রেণীতে, ১৯৮১–৮৩ সালে যথাক্রমে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে এবং

১৯৮৩ সালে নবম–দশম শ্রেণীতে চালু করা হয় । এই নতুন শিক্ষাক্রমের একটি অন্যতম লক্ষ্য ছিল দেশের আর্থসামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অর্থপূর্ণভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার পুনর্বিন্যাস এবং বিজ্ঞানকে আরো ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের কাছে লভ্য করে তোলা ।

নতুন যে শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হল তাতে শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের নানা সমস্যার সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে । শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান, যথোপযুক্ত মনোভঙ্গি সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় উপকরণাদি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । অবশ্য বাইরের পরিবেশ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ বা পরীক্ষাগারের বিকল্প নয়, পরিপূরক । প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় স্বাভাবিক পরিবেশ হবে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের প্রধান অঙ্গন, আর মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশের নানা উপকরণ শ্রেণীকক্ষের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে ।

বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও তার বাস্তবায়ন

অন্য যে কোন বিষয় শিক্ষার মতো শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করারও বিশেষ কতকগুলো উদ্দেশ্য রয়েছে । জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

(ক) নানা প্রাকৃতিক ঘটনা এবং চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি;
(খ) চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের দক্ষতা গড়ে তোলা;
(গ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের দক্ষতা অর্জন;
(ঘ) যুক্তিবাদী চিন্তাপদ্ধতি গড়ে তোলা;
(ঙ) পরিবেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজেদের ও অন্যদের জীবনমানের উন্নয়নে সহায়তা দান;
(চ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা গড়ে তোলা;
(ছ) বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক স্থাপন;
(জ) কিছুটা বৃত্তিমূলক দক্ষতা সৃষ্টি যাতে বিদ্যালয় ত্যাগ করে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই কোন উৎপাদনমূলক পেশা বেছে নিতে পারে;
(ঝ) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের জন্য বাঞ্ছিত মূল্যবোধ গড়ে তোলা ।

নতুন শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের নানা তথ্য বা মুখস্থবিদ্যার ওপর গুরুত্ব কমিয়ে এসব তথ্য ও তত্ত্বকে বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।

প্রাথমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানকে পৃথক বিষয় হিসেবে না দেখিয়ে পরিবেশ পরিচিতির অংশ হিসেবে ধরা হয়েছে । পরিবেশ পরিচিতির সমন্বিত শিক্ষাক্রমে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানের নানা মৌল বিষয়বস্তু এবং ধারণাকে এমনভাবে সমন্বিত করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা একেবারে জীবনের গোড়া থেকেই সেসবের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় লাভ করে । এর ফলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে তাদের পরিবেশ এবং পরিবেশের নানা সমস্যার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হবার সুযোগ হবে এবং এসব সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাধান করার উপযোগী মনোভঙ্গি ও দক্ষতা গড়ে উঠবে ।

প্রাথমিক স্তরের শিশুদের পরিচিত করতে হবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ যোগায় পরিবেশের এমন সব উপাদান, নানা জড়বস্তু, গাছপালা, পশুপাখি, সামাজিক পরিবেশ, আলো, তাপ প্রভৃতি নানা ধরনের শক্তি — এসবের সঙ্গে । পরিবেশ সম্পর্কে এমনি সমন্বিত শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই নিজেদের চারপাশের পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ করতে শিখবে এবং পরিবেশের নানা জড় ও জীব এবং নানা শক্তির মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হবে । প্রাকৃতিক পরিবেশকে পরীক্ষাগার হিসেবে গণ্য করার ফলে শিক্ষার্থীর কাছে বিজ্ঞানের শিক্ষা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে; তাছাড়া অসংখ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৃথক পরীক্ষাগার স্থাপনেরও প্রয়োজন দেখা দেবে না ।

বিদ্যালয়ের নিম্নমাধ্যমিক স্তরেও পরিবেশ পরিচিতি রয়েছে । এই স্তরে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক স্তরে লব্ধ অভিজ্ঞতার আরো বিস্তৃতি ঘটা প্রয়োজন । এজন্য বিজ্ঞানের নানা অঙ্গ যথা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতির মূল বিষয়গুলো সমন্বিতভাবে চর্চা করতে হবে ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি সুপারিশ করেছিলেন নবম ও দশম শ্রেণীর সব শিক্ষার্থীর জন্য বিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলিকে সমন্বিত করে দুই পত্রের (ভৌত-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞান) সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি প্রণীত হবে । প্রথম পত্রে থাকবে বিজ্ঞানের প্রকৃতি, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন । দ্বিতীয় পত্রে থাকবে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, স্বাস্থ্যনীতি ও পুষ্টি, জীববিদ্যার প্রয়োগ, জনসংখ্যা শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি । নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের এই নতুন পাঠ্যসূচি ১৯৮৩ সাল থেকে চালু করা হয় । কিন্তু প্রধানত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের শিক্ষকের স্বল্পতা এবং বিজ্ঞান শিক্ষা দানের উপযোগী উপকরণের অভাবের কারণে অল্পদিন পরই এই পাঠ্যসূচি সব শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক না রেখে নৈর্বাচনিক করা হয় । সেই সঙ্গে মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্বতন সাধারণ বিজ্ঞানও নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে চালু রাখা হয়। এই অবস্থা আজো চলছে । নবম–দশম শ্রেণীতে বিজ্ঞান আজও আবশ্যিক না হবার ফলে এই স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্ধেকেরও কম এখন বিজ্ঞান শেখার সুযোগ পাচ্ছে ।

শিক্ষাক্রম কমিটি মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাদানকে ফলপ্রসূ ও প্রয়োগমুখী করার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করেছিলেন । তার মধ্যে রয়েছে প্রতি শ্রেণীর জন্য শিক্ষক-নির্দেশিকা, ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ, বাড়ি বা বিদ্যালয়ের বাগানে ও খেতখামারে কাজ, বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপন এবং বিজ্ঞান ক্লাব গঠন । এসব ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের প্রাণবস্তুর সঙ্গে পরিচিত হতে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়ক হবে । পরিমার্জিত বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে শিক্ষক-নির্দেশিকা ১৯৮৮ সাল থেকে চালু হয়েছে ।

শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণ

আমাদের দেশে শিক্ষার প্রধান উপকরণ হল পাঠ্যপুস্তক । নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতির এবং ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞানের যে সব নতুন পাঠ্যবই ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলঃ (ক) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব দান, অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য স্থানীয় উপকরণের ওপর নির্ভরতা; (খ) মেধাবী বা আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু অতিরিক্ত বিষয়বস্তুর সংযোগ; (গ) প্রচুর অনুশীলনীর সমাবেশ — যাতে তত্ত্বগত ও সমস্যা-সমাধানমূলক উভয় ধরনের প্রশ্ন থাকে; (ঘ) পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার সীমিত রাখা ।

প্রতিটি অধ্যায়েই শিক্ষার্থীদের কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর বইতে 'নিজে কর' নামে প্রচুর হাতে-কলমে পরীক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্য যেসব বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ খুব সীমাবদ্ধ বা যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব রয়েছে তাদের পক্ষে এ ধরনের শিক্ষাদানে কিছুটা অসুবিধে সৃষ্টি হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আশির দশকের শুরু থেকেই বিদ্যালয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হতে থাকে ।

বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড (১৯৮১) নামে একটি সরকারী সংস্থা বিদ্যালয় পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক উপকরণ নির্মাণ, উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে বেশ কিছুকাল ধরে কাজ করে যাচ্ছে । এসব উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানেরও ব্যবস্থা রয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তত্ত্বাবধানে ইনস্টিটিউট অব সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেনটেশন নামে একটি সংস্থাও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মেরামত ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কাজ করছে । সাবেক শ্রুতিলোকন শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল ব্রডকাস্টিং প্রজেক্ট একীভূত করে ১৯৮৩ সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল মিডিয়া এন্ড টেকনোলজি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় । পরবর্তীকালে (১৯৮৫) এই প্রতিষ্ঠানকে 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিস্টান্স এডুকেশন' (বাংলাদেশ দূরশিক্ষণ ইনস্টিটিউট) বা 'বাইড' (BIDE) নামকরণ করা হয়েছে । বিশেষ করে বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ।

১৯৮৫ সাল থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর গুরুত্বসহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প চালু হয়েছে । এই প্রকল্পের অধীনে ৩,৮০০ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ২০০ মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শ্রেণীকক্ষ-পরীক্ষাগার নির্মাণ (১,৭০০ প্রতিষ্ঠানে), আসবাবপত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, শিক্ষা উপকরণ ও বইপত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । এছাড়া এর মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের জন্য ব্যাপক আকারে কর্মকালীন সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে । ১৯৮৭-৯১ এই চার বছরে প্রায় উনিশ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এরকম প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেছেন । এই প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে দেশের ন'টি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজে 'মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র' গড়ে তোলা হয়েছে; তার মাধ্যমে আগামীতে আরো ব্যাপক আকারে কর্মকালীন শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক শিক্ষণ সহায়তা দেবার ব্যবস্থা গৃহীত হবে । এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রতি বছর মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় দশ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মকালীন প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পাবেন ।

উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরে বিজ্ঞান

মাধ্যমিক স্তরের মতো উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরেও সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপক পরিমাণগত বিস্তৃতি ঘটেছে । বিগত দু'দশকে দেশে ডিগ্রি স্তরে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বহুগুণে বেড়েছে । এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দশগুণ বেড়েছে এবং বর্তমানে মোট শিক্ষার্থীর প্রায় চল্লিশ শতাংশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে অধ্যয়ন করছে । অবশ্য গুণগত দিক থেকে ডিগ্রি স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যা অনেকটা আগের মতোই রয়ে গিয়েছে অর্থাৎ শিক্ষাক্রম সেকেলে ও অনুপযোগী, পাঠদান পদ্ধতি দুর্বল, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণের অভাব প্রকট । উচ্চশিক্ষা স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষা পদ্ধতির এধরনের দুর্বলতা স্বভাবতই বিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা দানের ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

১৯৭৫ সালের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য নতুন পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু তা আজও বাস্তবায়ন করা হয় নি । ডিগ্রি স্তরের জন্য বাংলা একাডেমী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কিছু কিছু নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে, কিন্তু তার পরিমাণ ও গুণগত মান সাধারণভাবে তেমন সন্তোষজনক নয় । উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি প্রধান দায়িত্ব হল গবেষণার মাধ্যমে

নতুন জ্ঞান সৃষ্টি । কিন্তু দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য যে সুযোগ বা ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা এখনও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ।

কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে 'বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' বিষয়ে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল । ডিগ্রি স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার পরিস্থিতি সম্পর্কে এই সেমিনারের সুপারিশমালায় বলা হয়।

> শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা গড়ে তোলা। পরীক্ষার প্রশ্নগুলি এমন হওয়া প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তরে শুধু মুখস্থ করার ক্ষমতা নয়, সমস্যার প্রকৃত উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটে । বিজ্ঞান শিক্ষা এমনভাবে পরিকল্পিত এবং পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের বাস্তব জীবনের সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে ।

এ অবস্থার আজো তেমন গুণগত পরিবর্তন ঘটে নি । ডিগ্রিস্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু যে বিষয়বস্তুর আধুনিকীকরণ প্রয়োজন তা নয়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করা প্রয়োজন অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রবণতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং দেশের আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রেরণা ।

সকলের জন্য বিজ্ঞান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে শুধু গুটিকতক বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করাই যথেষ্ট নয়— বিজ্ঞানের জ্ঞান ও চেতনা ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হতে হবে সমগ্র জনসমাজের মধ্যে । আর এজন্য একটি প্রাথমিক শর্ত হল মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীর জন্য বিজ্ঞানকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে চালু করা । ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন এবং ১৯৮৮ সালের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন এই সুপারিশ করেছেন । তাঁদের সে সুপারিশ কার্যকর করতে হলে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তৃতির জন্য আরো বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে । যে সব বিদ্যালয়ে এখনও বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ-সুবিধে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি, সেগুলিতে জরুরি ভিত্তিতে এই সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন; যে সব শিক্ষক-শিক্ষিকা এখনও নতুন ধারার বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নি, তাঁদের এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে; ক্রমবিবর্তনশীল বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি ক্রমাগত পরিমার্জনা এবং নবায়নের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা প্রয়োজন ।

আর সর্বোপরি দেশময় বৈজ্ঞানিক চেতনা ও কর্মোদ্যোগ সঞ্চারকে জাতীয় অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করতে হবে । আধুনিক জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে এছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ আমাদের জন্য খোলা নেই ।

মানব সম্পদ উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আজকের দিনে যে কোন দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তিরূপে গণ্য হয়ে থাকে। এ কারণেই আজ পৃথিবীর সব দেশেই মানব সম্পদ উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। বলা চলে, যে সব দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় বিশেষ জোর দিচ্ছে সেগুলোই অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের পথে দ্রুত অগ্রসর হতে পেরেছে ।

বিজ্ঞান বলতে আজ যা বোঝায় তা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি । সেকালে আধুনিক বা তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারা ছিল অতি ক্ষীণ — শিক্ষার সনাতন পদ্ধতিই ছিল মূল ধারা । আজ বরং এর উলটোটাই সত্যি । দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের মোট শিক্ষার্থীর পনের শতাংশের মতো আজ সনাতন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ছে । মাধ্যমিক পর্যায়ে সনাতন ধারার শিক্ষার্থী মোটামুটি দশ শতাংশ। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সনাতন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও স্থান পেতে আরম্ভ করেছে ।

শিক্ষার কাঠামো

বর্তমানে বাংলাদেশে যে সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি আছে তাতে রয়েছে পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক স্তর, তিন বছরের নিম্নমাধ্যমিক, দু'বছরের মাধ্যমিক এবং দু'বছরের উচ্চমাধ্যমিক স্তর। মাধ্যমিক স্তরের শেষ পরীক্ষার পর 'সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট' (এসএসসি) এবং উচ্চমাধ্যমিক ধাপের শেষ পরীক্ষার পর 'হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট' (এইচএসসি) প্রদান করা হয় । মাদ্রাসায় অনুরূপ কাঠামোতে রয়েছে পাঁচ বছর মেয়াদী 'ইবতেদাই' (অথবা প্রাথমিক), পাঁচ বছরের 'দাখিল' এবং দু'বছরের আলিম' স্তর। দেশে ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-গুলিতে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার একটি পৃথক ধারা রয়েছে । ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষাক্রমের মেয়াদ দু'বছর; আট বছরের সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করেছে এ ধরনের শিক্ষার্থীদের (কোন কোন ক্ষেত্রে এসএসসি পাস করার পর) সেখানে ভর্তি করা হয় । পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর শিক্ষাক্রম তিন বছরের; এতে এসএসসি পাশ শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারে ।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা দেশে এখনও সর্বজনীন করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি; ওই বয়ঃক্রমের মাত্র ৭০ শতাংশ এখন বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পায়। মাধ্যমিক স্তরে এই হার আরো কম —মাত্র ২৫ শতাংশ; উচ্চশিক্ষার স্তরে মাত্র ৫ শতাংশ।

১৯৯০ সালের জুন পর্যন্ত বিদ্যমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সেগুলোর শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যা সারণী ১-এ দেখানো হলঃ

সারণী ১ঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য (১৯৯০)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা
সাধারণ শিক্ষা			
(ক) প্রাথমিক স্কুল	৪৫,৯১৭	১১৯,৩৯,৯৪৯	১,৮৯,৫০৮
(খ) মাধ্যমিক স্কুল	১০,৪৪৮	২৯,৯৩,৭৩০	১,২২,৮৯৬
(গ) ইন্টারমিডিয়েট কলেজ	৩৬৭	১,৪৩,৩০৪[১]	৫,০৪৯৩
মাদ্রাসা শিক্ষা			
(ক) দাখিল মাদ্রাসা	৪,৩০৬	৬,১৫,৩৫৮[২]	৫৬,৮৯৬
(খ) আলিম মাদ্রাসা	৭৬০	১,৫৭,৪১০[২]	১২,৬৬৩
বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা			
(ক) বৃত্তিমূলক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	৫১	৩,৪৫৮	৪৬৪
(খ) টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (১৯৮৯)	১২	৩,০৩০	৩৯৫
(গ) টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট (১৯৮৯)	৩৩	৮০৯	২১৮
(ঘ) পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	১৮	১১,৮৪৭	৭৯৮
(ঙ) মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট[৩]	৪	৫৭৮	৬১

[১] এছাড়া দেশের ৪৮১টি ডিগ্রি কলেজে এইচ এস সি পর্যায়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪,২৫,১৫৭।

[২] বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা মিলিয়ে দাখিল ও আলিম পর্যায়ের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৭৩,২৮৩ ও ৩৭,৮৫৯।

[৩] এই চারটি প্রতিষ্ঠান হল গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট, গ্লাস ও সিরামিক ইনস্টিটিউট, সার্ভে ইনস্টিটিউট ও মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট।

উৎস ঃ বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রায় ৮৫ শতাংশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত। মোট প্রায় ১১৯ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬৬ লক্ষ ছেলে এবং ৫৩ লক্ষ মেয়ে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিপুল হারে শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় ত্যাগ। প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষ; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে পৌঁছে এই সংখ্যা হয় ২৭ লক্ষ এবং ক্রমান্বয়ে এভাবে কমতে কমতে ৫ম শ্রেণীতে মাত্র ১৫ লক্ষে দাঁড়ায়।

মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার অধিকাংশই বেসরকারী। এখানেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ৩৪ শতাংশ মেয়ে; মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এই অনুপাত আরও কম — মাত্র ৬ শতাংশ। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার প্রাথমিক পর্যায়ের মতো অতটা প্রকট না হলেও পরিমাণে যথেষ্ট বেশি। শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৭.৮ লক্ষ; কিন্তু তা কমে ৮ম শ্রেণীতে ৬.৩ লক্ষে এবং ১০ম শ্রেণীতে ৩.৯ লক্ষে দাঁড়ায় অর্থাৎ এর মধ্যে অর্ধেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে।

বিজ্ঞানের স্থান

শিক্ষা পদ্ধতির প্রধান ধারা যে সাধারণ বিদ্যালয়গুলি তাতে বিজ্ঞান-উপাদান তেমন সবল নয়। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সাধারণ বিজ্ঞান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে এবং মাধ্যমিক স্কুলের ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় আবশ্যিক ছিল না বলে অনেক স্কুল এ বিষয়টি পড়ানোর জন্য মোটেই মাথা ঘামাতো না। ১৯৬১ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে বহুমুখী শিক্ষাক্রম চালু করা হয় এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে সাধারণ বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করা হয়। বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্পকলা এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগে বিশেষ বিজ্ঞান বিষয় হিসেবে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং জীববিদ্যা চালু করা হয়।

বিজ্ঞানের জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এবং পরীক্ষণের যন্ত্রপাতির অভাবে মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে বিজ্ঞান বিভাগ এবং অন্যান্য বহুমুখী বিষয়ের প্রবর্তন এগোতে থাকে ধীর গতিতে। ১৯৮৩ সালে একমুখী শিক্ষাক্রম চালু করে তাতে বিজ্ঞানকে আবশ্যিক করা হয়; কিন্তু অনেক স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষার সুব্যবস্থা নেই বলে বিষয়টি এখনও ঐচ্ছিক রয়ে গিয়েছে। আজ এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ গ্রহণকারীর সংখ্যা মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ এবং বিজ্ঞান নিয়ে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মোট উত্তীর্ণদের প্রায় ৬০ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে যত ছেলেমেয়ে উত্তীর্ণ হয় তার মধ্যে বিজ্ঞান নিয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩৫ শতাংশ।

মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য আশির দশকের মাঝামাঝি দু'টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তার একটি হল মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্প এবং অন্যটি শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্প। প্রথম প্রকল্পটির আওতায় দেশের ৪,০০০ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় বিজ্ঞান ভবন, যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ প্রভৃতি উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১৯,০০০শিক্ষককে কর্মকালীন প্রশিক্ষণও

দেওয়া হয়েছে । এছাড়া ভবিষ্যতে নিরবচ্ছিন্নভাবে শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দানের জন্য ন'টি শিক্ষক–প্রশিক্ষণ কলেজের সঙ্গে ন'টি মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে । দ্বিতীয় প্রকল্পের আওতায় দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ডিজাইন তৈরি ও বাণিজ্যিক উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন বোর্ডকে শক্তিশালী করা হয়েছে ।

বিগত তিন দশকে দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার হার যে পরিমাণগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা সারণী ২ থেকে বোঝা যাবে ।

সারণী ২ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পরীক্ষায় বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্তীর্ণদের হার

	মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষা		উচ্চমাধ্যমিক শেষ পরীক্ষা		স্নাতক পরীক্ষা	
	মোট উত্তীর্ণ	বিজ্ঞানে উত্তীর্ণ	মোট উত্তীর্ণ	বিজ্ঞানে উত্তীর্ণ	মোট উত্তীর্ণ	বিজ্ঞানে উত্তীর্ণ
১৯৬০	২৫,১৩৯	---	৬,৪৯৪	১,৭৩৭ (২৬.৭%	৪,৪৩৯	১,০৫০ (২৩.৭%
১৯৭০	১০৯,১৬৮	২২,১০৮ (২০.২%	৫৩,৩৪৪	১১,৪৫৯ (২১.৫%	১৪,৩০০	৩,৫০০ (২৪.৫%
১৯৮০	১১৭,৫৯৪	৫০,৮৮৩ (৪৩.৩%)	৬২,৩৮২	২৮,৬০৬ (৪৫.৯%)	২৭,৫৩১	৮,২০৩ (২৯.৮%
১৯৯০	১৩৮,৩১৭	৮১,৪২৯ (৫৮.৯%	৮৭,৪১৯	৩০,৯৬৫ (৩৫.৪%)	৫৮,৫৩৪	১১,২৮১ (১৯.৩%

সূত্র ঃ বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো । বন্ধনীতে মোট উত্তীর্ণের মধ্যে বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে উত্তীর্ণের শতকরা হার দেখানো হয়েছে । স্নাতক পর্যায়ের সর্বশেষ তথ্য ১৯৮৭ সালের ।

এই সারণী থেকে দেখা যায়, মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯০ সালে বিজ্ঞানসহ উত্তীর্ণের হার ২০ শতাংশ থেকে ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে প্রায় ৬০ শতাংশে পৌঁছেছে । কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ও ডিগ্রি স্তরে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে উত্তীর্ণের হার ক্রমাগত বাড়লেও আশির দশকে কমে গিয়ে ১৯৯০ সালে যথাক্রমে ৩৫ শতাংশ ও ১৯ শতাংশ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে । এখানে উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অনুপাত ৫০ শতাংশ বা তারও ওপরে ।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষার ধারা প্রধানত ষাটের দশকে চালু হয় । বর্তমানে দেশে ৫১টি বৃত্তিমূলক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রায় ৩,৫০০ এবং আরো ১২টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে প্রায় ৩,০০০ শিক্ষার্থী মোট ১৮টি পৃথক পৃথক ট্রেডে দু'বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে । তাছাড়া ৩৩টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে প্রায় ৮০০ প্রশিক্ষণার্থী আছে । এ ছাড়া ১৬টি সরকারী এবং বেশ কয়েকটি বেসরকারী কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটও রয়েছে। প্রযুক্তিগত শিক্ষার পর্যায়ে ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে প্রায় ১২,০০০ শিক্ষার্থী রয়েছে। এছাড়া রয়েছে ৪টি মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট — যেমন সার্ভে, কাচ ও সিরামিক, নৌ–প্রযুক্তি এবং মুদ্রণকলার ।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ (০.৫ শতাংশ) বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে । বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোতে যে সব বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে কৃষি মেকানিক, বিদ্যুৎ মেকানিক, অটো মেকানিক, মেশিনিস্ট, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেশন, কাঠের কাজ ও ফিটিং । পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে যে সব ডিপ্লোমা কোর্স রয়েছে তাতে অন্তর্ভুক্ত হল পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল, শক্তি–প্রকৌশল এবং বিদ্যুৎ–প্রকৌশল । মাত্র ক'বছর আগেও বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় ও পলিটেকনিকগুলোতে যথেষ্ট শিক্ষার্থী পাওয়া যেত না । কিন্তু বর্তমানে দেশের ভেতরে ও বাইরে কারিগরি জনশক্তির চাহিদা বাড়ার ফলে আজ এ অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে— এসব প্রতিষ্ঠানে আজকাল প্রচুর শিক্ষার্থী ভর্তি হতে আসছে । বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তি কোর্সে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রয়েছে ।

বিভিন্ন স্তরে আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতি ও পরিবেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়— এ অভিযোগ পুরনো । শিক্ষাবিদরা জানেন যে, শিক্ষা লাভ শুধু বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে ঘটে না; কিন্তু বিদ্যালয়ের বাইরের বাস্তব জীবনের নানা শিক্ষা–সহায়ক উপকরণ বিজ্ঞান শিক্ষার কাজে ব্যবহারের উদ্যোগ তেমন একটা নেওয়া হয় নি । শিক্ষার্থীর জীবনের পরিবেশও যে পরীক্ষা–নিরীক্ষার গবেষণাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে স্থানীয় উপকরণ ও অভিজ্ঞতাকে শিক্ষাদানের অঙ্গীভূত করার চেষ্টাও তেমন দেখা যায় নি ।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা

আমরা আগেই দেখেছি যে, আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর গুরুত্ব মোটেই আশানুরূপ নয় । অথচ জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বৈজ্ঞানিক জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে এক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার সুযোগ–সুবিধের বিস্তার

একান্তই জরুরি । দেশে বর্তমানে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সহ আটটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে । এছাড়া আছে দশটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, প্রকৌশল শিক্ষার চারটি ইনস্টিটিউট, তিনটি কৃষি মহাবিদ্যালয় এবং আরো অন্যান্য বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ।

বাংলাদেশে বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীর সংখ্যা আনুমানিক ৬০,০০০ । তার মধ্যে মাত্র দশ শতাংশ অর্থাৎ মোটামুটি ৬,০০০ জন সরাসরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত । তাছাড়া আর কিছু সংখ্যক নিয়োজিত রয়েছেন বিভিন্ন ধরনের সহায়ক কর্মকাণ্ডে । কিন্তু বর্তমানে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়নে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা একে নিতান্ত কম, তার ওপর তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছড়ানো অসংখ্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে । প্রায়শ এসব প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে তেমন সংযোগ নেই। তার ফলে তাঁদের বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড দেশের অর্থনীতিতে তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য ছাপ ফেলতে পারছে না ।

ঐতিহাসিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মৌলিক বা তাত্ত্বিক গবেষণার সূতিকাগার হিসেবে গণ্য করা হয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভূমিকা শুধু প্রচলিত জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো নয় বরং গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন — এ ধারণা প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে উনিশ শতকের শুরুতে জার্মানিতে । এই ঐতিহ্য ক্রমে অন্যান্য সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ই গ্রহণ ও পালন করেছে । তবে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নতুন জ্ঞান — বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত জ্ঞান — উদ্ভাবনের মৌল দায়িত্ব পালন নানা কারণে অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছে । এসব কারণের মধ্যে রয়েছেঃ

১. যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য শিক্ষকের এবং তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারের বিষয়ে অবহিত থাকার সুযোগের অভাব;

২. গবেষণাগার, যন্ত্রপাতি, চলতি ব্যয়, বইপত্র ও সাময়িকপত্র প্রভৃতি বস্তুগত সুযোগ–সুবিধের সীমাবদ্ধতা;

৩. অনেক ক্ষেত্রে পুরনো ধাঁচের শিক্ষাক্রম যাতে সমস্যা সমাধান বা অনুসন্ধানের চেয়ে মুখস্থ জ্ঞানের ওপর বেশি জোর দেয়া হয়;

৪. স্থানীয় বা আঞ্চলিক সমস্যার সঙ্গে গবেষণা কার্যক্রমের যোগসূত্রের অভাব;

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্রের সমন্বয়ের সীমাবদ্ধতা;

৬. উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার কাজে মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অমনোযোগ ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে গবেষণাকর্মী না পাবার দু'টি প্রধান কারণ হল বস্তুগত সুযোগ–সুবিধের অপ্রতুলতা এবং গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব । মূলত এসব কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বহু যোগ্য শিক্ষক মধ্যপ্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের নানা দেশে পাড়ি জমিয়েছেন । দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই যেখানে গবেষণার পরিবেশ এমন অনাকর্ষণীয়, সেখানে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রায় পাঁচশ ডিগ্রি কলেজে তার মধ্যে দু'শর ওপর সরকারী ও প্রায় তিনশ বেসরকারী। এই পরিবেশ একেবারেই অনুপস্থিত বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, তুলনামূলকভাবে এসব কলেজে শিক্ষার্থীর সমষ্টিগত সংখ্যা বহুগুণে বেশি— বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রায় ৫০,০০০ আর কলেজগুলিতে ডিগ্রি স্তরে প্রায় ২৬০,০০০।

দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণাকর্মের জন্য অর্থ বরাদ্দ যে কত সীমিত তার নজির পাওয়া যাবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গবেষণার জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করেন তার পরিমাণ থেকে । ১৯৮৭ সালের মঞ্জুরি কমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় এবছর কমিশন সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মোট মঞ্জুরি (আবর্তক ও উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে) দিয়েছিলেন প্রায় ৮৫.৩৪ কোটি টাকা । তার মধ্যে গবেষণার জন্য মঞ্জুরি ছিল মাত্র ৭.৮১ লক্ষ— অর্থাৎ মোট অর্থ বরাদ্দের হাজার ভাগের একভাগেরও কম ।

শিক্ষাব্যবস্থা এখনও দুর্বল

আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের দুর্বলতার বিষয় বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও অন্যান্য দায়িত্বশীল সংস্থা উল্লেখ করেছেন । প্রধান প্রধান দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বল্পতা, দেশীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব, সেকেলে শিক্ষা পদ্ধতি, উপযুক্ত পাঠ্য বই, শিক্ষক–নির্দেশিকা এবং শিক্ষাক্রম–সহায়ক উপকরণের অভাব । শিক্ষার প্রতি সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি একটি গুরুতর সমস্যা । এই শিক্ষা পদ্ধতি মূলত মুখস্থবিদ্যানির্ভর এবং প্রকৃতিগতভাবে বিজ্ঞানের পদ্ধতির বিরোধী । মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি বিধান এই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য নয় ।

অতি সামান্য বা সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যেও যথেষ্ট ভাল বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । শিক্ষক যদি উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন হন এবং হাতের কাছে পাওয়া উপকরণের সাহায্যে উদ্ভাবনে ইচ্ছুক হন তাহলে আমাদের চারপাশে লভ্য স্বল্পমূল্যের উপকরণ দিয়েও বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব ও ধারণা সার্থকভাবে শিক্ষাদান করা যায় । জরুরি হল— বিজ্ঞানের মূলনীতি এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্বদান, অসংলগ্ন তথ্য মুখস্থ করার পরিবর্তে ধারণার উপলব্ধি ও প্রয়োগের ওপর প্রাধান্য আরোপ,

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের দক্ষতা, বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করা এবং প্রকৃতির অনুসন্ধান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা গড়ে তোলা । আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষায় এই উপাদানগুলোর এখন পর্যন্ত দুঃখজনক অভাব রয়েছে ।

প্রযুক্তি শিক্ষার বেলাতেও একথা সত্য । ঐতিহ্যগতভাবে এ শিক্ষাকে 'বাবু' বা 'সাহেব' শ্রেণীর জীবিকার প্রবেশ পথ বলে গণ্য করা হয়েছে । সেজন্য সাধারণত হাতে-কলমে কাজ এবং উৎপাদনমূলক দক্ষতা গড়ে তোলার প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা প্রকাশ করা হয় । এর ফলে আমাদের অর্থনীতিতে একদিকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত যুবকের বেকারত্ব এবং অন্যদিকে কৃষি, শিল্প ও সেবামূলক ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির প্রকট অভাব— এই বিপরীতমুখী সংকট সৃষ্টি হয়েছে । দেশে প্রযুক্তিগত শিক্ষার বিকাশও হয়েছে ভারসাম্যহীন । যেখানে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও দক্ষ কর্মীর আনুপাতিক হার হওয়া উচিত ১ঃ৫ঃ২৫ সেখানে বর্তমানে আমাদের দেশে এই অনুপাত হল মোটামুটি ১ঃ৩ঃ২ ।

দেশের পরিকল্পনাবিদরা বলছেন আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বিরাট গ্রামীণ জনশক্তির উন্নয়ন ছাড়া এদেশের উন্নতি সম্ভব নয় । সেজন্য জাতীয় পরিকল্পনায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের ওপর উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে । কিন্তু এই কর্মসূচিগুলো একই সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া চাই এমন সুবিন্যস্ত শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে যা যান্ত্রিক মুখস্থবিদ্যা বর্জন করবে এবং অনুসন্ধানের মনোভাব সৃষ্টি করবে, প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন এবং উৎপাদনের সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের ওপর জোর দেবে । এক্ষেত্রে শিক্ষকদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রস্তুতিমূলক এবং কর্মকালীন সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে আজ তাই অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির সংযোগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ বিশেষ অগ্রাধিকার দাবী করে ।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে এভাবে পুনর্গঠন করা একটা বিরাট কাজ— এর জন্য প্রয়োজন দেশের পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও সমাজ-চিন্তাবিদদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা । দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার ঐতিহ্য রাতারাতি বদলে ফেলা সম্ভব নয়; কিন্তু সামাজিক রূপান্তরের প্রভাব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অগ্রগতি এবং জাতীয় উন্নয়নের জরুরি প্রয়োজন— এ সবই আজ বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার দ্রুত উন্নয়নের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে ।

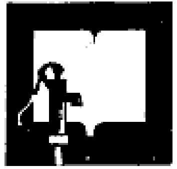

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সমাজ ও শিক্ষা

আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপুল প্রভাব আজ আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার বিষয় নয় । উনিশ শতক বা এমন কি বিশ শতকের শুরুতেও এ বিষয়ে যুক্তিজাল বিস্তারের সুযোগ ছিল, কিন্তু আজ তা একান্তই স্বতোভাস্বর । আর এ প্রভাব শুধু উন্নত দেশের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়— বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশেও আমাদের কলের পানি, বিজলির আলো, খেতের সার বা কীটনাশক, সেচের যন্ত্র, পরবার কাপড়, রোগের ওষুধ, জন্মশাসনের উপকরণ, যাতায়াতের যানবাহন— এসব কিছুর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছাপ আজ অতি স্পষ্ট আর গভীর ।

অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, উন্নত দেশগুলো যে পরিমাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান ভোগ করছে, আমাদের মতো অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের মানুষ তার সুফলের আস্বাদ পাচ্ছে সে তুলনায় অনেক কম । বলা চলে আজকের পৃথিবীতে যে দেশ যত বেশি পরিমাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদানকে কাজে লাগাতে পেরেছে সে দেশ তত বেশি সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে । অর্থনীতিবিদরা অনেক উন্নত দেশের সমৃদ্ধির পেছনে পুঁজি ও শ্রমের বাড়তি উপাদান হিসেবে প্রযুক্তিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে সংখ্যাতাত্ত্বিক সূচক দিয়ে নির্দেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন ।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়ন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের আপেক্ষিক ভূমিকা নিয়ে আমাদের দেশে অনেকের মধ্যে আজও বেশ কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে । বিজ্ঞানের একটি সাদামাটা সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যেতে পারেঃ 'পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে সুশৃঙ্খলভাবে প্রাকৃতিক নানা ঘটনার স্বরূপ ও কার্যকারণ অনুসন্ধানই বিজ্ঞান ।' আর প্রযুক্তির সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে এভাবেঃ 'প্রকৃতির নানা বস্তু ও শক্তি ব্যবহার করে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বা স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সৃষ্টির কৌশল হল প্রযুক্তি ।'

তবু এর পরও প্রশ্ন থেকে যায়ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে কোনটির উদ্ভব আগে? কোনটি বেশি জরুরি? —পন্ডিতরা আজ মোটামুটি একমত যে, আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞানের

জন্মের অনেক আগেই মানুষ প্রকৃতির নানা উপাদান ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের কলা-কৌশল অর্থাৎ প্রযুক্তি আয়ত্ত করতে আরম্ভ করেছে । আগুন ও চাকার ব্যবহার, পোশাক, বাসস্থান, শিকার, কৃষি, পশুপালন, চিকিৎসা প্রভৃতির সহজ সরল প্রযুক্তি মানুষ উদ্ভাবন করেছে আজ থেকে বহু হাজার বছর আগেই । অথচ সে তুলনায় প্রকৃতির নিয়ম-কানুন উদঘাটন করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের ঘটনার পূর্বাভাস দিতে শিখেছে মানুষ মাত্র আজ থেকে চার-পাঁচ হাজার বছর আগে ব্যাবিলনীয়, ভারতীয় কিংবা গ্রীক সভ্যতার সময়ে ।

গ্রীক সভ্যতার কালে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা প্রযুক্তির বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাহায্যে নানা ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান করে আর্কিমিডিস (আনুমানিক ২৮৭-২১২ খ্রিঃ পূঃ) সেই প্রাচীনকালেই বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । পরবর্তীকালে সতের-আঠার শতকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের নানা উদ্ভাবন বাষ্পীয় ইঞ্জিন, রঞ্জনশিল্প প্রভৃতি নতুন নতুন প্রযুক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে ।

অবশ্য সেই সঙ্গে বলতে হয় যে, প্রযুক্তির বিকাশও বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অসামান্য অবদান রেখেছে । ষোল-সতের শতকে হল্যান্ডে যেসব কারিগর কাচ ঘষে ঘষে লেন্স তৈরি করতেন তাদের সহায়তা না পেলে গালিলিও গালিলেই (১৫৬৪-১৬৪২)-এর পক্ষে দূরবীন এবং তার সাহায্যে মহাকাশের রহস্য আবিষ্কার বা আন্টন ভ্যান লেভেনহুক (১৬৩২-১৭২৩)-এর পক্ষে অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং তার সাহায্যে অণুজীব-জগতের রহস্য উদঘাটন সম্ভব হত না ।

এভাবে দেখলে দেখা যাবে আমাদের আধুনিক সভ্যতা এবং উন্নত দেশগুলোর বিপুল সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন । মানুষ তার জীবনযাত্রার প্রয়োজনে কিছু কিছু সরল প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে অতি আদিমকাল থেকেই । কিন্তু তার উৎপাদনশক্তির অপরিমেয় উন্নতি এবং জীবনযাত্রার বিপুল স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন সম্ভব হয়েছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ও সমন্বয়ের ফলে । তাই একদিকে যেমন নিছক তত্ত্বগত বিজ্ঞান মানুষের ব্যবহারিক জীবনে তেমন পরিবর্তন আনতে পারে না, তেমনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরশমণি ছাড়া সনাতন প্রযুক্তি আজকের দিনের পৃথিবীতে প্রায়শই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে অক্ষম ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই ব্যবহারিক বা প্রয়োগমূল্যকেই বড় করে দেখলে অবশ্য তার সবটা দেখা হয় না। বিজ্ঞান শুধু জীবন যাপনের বা আরাম-আয়েশের কিছু উপকরণের জন্ম দেয় না, এই বিশ্বচরাচরের প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের মধ্যে নতুন উপলব্ধি এবং চেতনাও সঞ্চারিত করে। এই চেতনার মাধ্যমে মানুষ আরো বেশি অনুসন্ধানী হয়ে ওঠে, আরো বেশি সৃজনশীল ও উদ্ভাবনশীল হয় । আবার তেমনি সুস্থ বিজ্ঞানবুদ্ধির অভাবে মানুষ স্বার্থান্ধ হয়ে উঠতে পারে। এক শ্রেণীর অজ্ঞ অথবা মুনাফালোভী মানুষের ধ্বংসাত্মক প্রবণতা এবং তার ফলে আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশের দ্রুত অবক্ষয় তার সাক্ষ্য দেয় ।

আজকের পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-শতাংশ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ। আর প্রতি দশকে মানুষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞানের মোট ভাণ্ডার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। এসব যেমন সত্য তেমনি এও সত্য যে, সারা দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের এক-চতুর্থাংশ আজ নিয়োজিত ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের গবেষণায় । পরমাণু-বোমা, রাসায়নিক অস্ত্র, জীবাণু-অস্ত্র, আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, মহাকাশে স্থাপিত লেজার মারণরশ্মি প্রভৃতি নানা আধুনিক বিধ্বংসী অস্ত্রের উন্নতির জন্য অসংখ্য বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের সর্বক্ষণিক চেষ্টা নিয়োজিত ।

সেই সঙ্গে ১৯৮৫ সালে ভূপালের কীটনাশক কারখানায় রাসায়নিক বিস্ফোরণে তিন হাজারের বেশি লোকের মৃত্যু, ১৯৮৬ সালে চেরনোবিলের পরমাণু-শক্তি-কেন্দ্রে বিস্ফোরণ প্রভৃতি ঘটনা এবং পৃথিবীর আবহাওয়াগত বিপর্যয়, মরুকরণ, বৃক্ষ-নিধন, পানীয় জলের সঙ্কট, বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থের বিস্তার প্রভৃতি প্রবণতা বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের ভয়াবহ ফল সম্বন্ধে সারা দুনিয়ার মানুষকে সচেতন করে তুলেছে ।

শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

এসব থেকে একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা চলেঃ সে হল বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সমাজ জীবনে ও উৎপাদন ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই দুয়েরই ব্যাপক প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন । এপথেই শুধু এদেশের দ্রুত আর্থসামাজিক বিকাশ ঘটা সম্ভব । আর এজন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকতে হবে ।

সুখের বিষয় ডঃ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন এসত্যটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এজন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালাও পেশ করেছিলেন । এই কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বলেছেনঃ

> ১৫.২ বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য যে শুধু প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগে এক শ্রেণীর মানুষকে শক্তিশালী করে তোলা তা নয়, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা । এর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানের সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ । সমাজের কল্যাণে বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমেই এরূপ যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে ।..... জগতের বিভিন্ন দেশ বিজ্ঞান শিক্ষার যে অগ্রগতি সম্পাদনে সমর্থ হয়েছে আমরা তার তুলনায় বহু পশ্চাতে পড়ে আছি । এ অবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন । বিজ্ঞান শিক্ষাকে অধিকতর ব্যাপক এবং অন্যান্য দেশের মানের সমকক্ষ করতে হবে । (*বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট*, ১৯৭৪, পৃঃ ১০৮)

এই সুপারিশকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য ১৯৭৫–৭৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি প্রণীত পাঠ্যসূচির ভূমিকায় বলা হয়েছেঃ

> ..... বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে ধার করা কেতাবী শিক্ষায় পরিণত না করে তাকে আমাদের পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত এবং আমাদের সমস্যা সমাধানের উপযোগী করে নির্মাণ করার প্রচেষ্টার উপর নতুন পাঠ্যসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । এজন্য প্রাথমিক স্তরে অবশ্যপাঠ্য বিষয় হিসেবে 'পরিবেশ পরিচিতি' নামে একটি নতুন বিষয়ের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞান ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মৌল ধারণাগুলো শিক্ষার্থীর মনে তার শৈশবকাল থেকেই স্থাপন করার জন্য পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে । একই উদ্দেশ্যে নিম্নমাধ্যমিক স্তরে সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানকে অবশ্যপাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং মাধ্যমিক স্তরে উল্লিখিত সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোকে ব্যাপকত্ব ও গুরুত্বদানের জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে । (রিপোর্ট, তৃতীয় খন্ডঃ মাধ্যমিক স্তর, ১৯৭৮ পৃঃ ৯)

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত বিজ্ঞানশিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার পেছনে দীর্ঘদিনের পরাধীনতার অভিশাপ অনেকাংশে কাজ করেছে । প্রায় দু'শ বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর দু'যুগের পাকিস্তানী আমলে জাতীয় স্বার্থকে সামনে এনে সত্যিকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি । এই পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটেছে ডঃ মফিজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত ১৯৮৭–৮৮ সালের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেঃ

> ৮.১০ আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার আবির্ভাব অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে ঘটেছে; তার ফলে এদেশে এখনো বিজ্ঞান শিক্ষা, শিক্ষণ ও গবেষণার যথোপযুক্ত ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি। সমগ্র জনসমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞানমনস্কতা বিস্তৃত না হলে এই ঐতিহ্য গড়ে তোলা দুঃসাধ্য ।
>
> ৮.১১ বিজ্ঞান শিক্ষা শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়; তার সঙ্গে পরীক্ষা–নিরীক্ষা, হাতে কলমে কাজ ও অনুসন্ধান গভীরভাবে সম্পৃক্ত । দুর্ভাগ্যক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এবং অভিভাবকগণ সম্যক অবহিত না হওয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষকগণও উপযুক্ত সুযোগ–সুবিধা ও পরিবেশের অভাবে তাঁদের শিক্ষাদানকার্যে যথেষ্ট অবদান ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন না। বিজ্ঞান শিক্ষা শুধু পুঁথির মাধ্যমে লাভ সম্ভব নয়, এজন্য শিক্ষকের যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষাদান অনেকাংশে অর্থহীন— এ সকল বিষয়ে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আজো যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন নন। (বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮৮, পৃঃ ১৪৪)

দীর্ঘকালের অবহেলার ফলে আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বিশাল ও গভীর দৈন্যের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাব কাটাতে হলে দীর্ঘদিনব্যাপী সুবিন্যস্ত ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশিক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শেষোক্ত কমিশন তাঁদের রিপোর্টে অন্যত্র বলেছেন,

> ''বিজ্ঞানের সাথে রয়েছে জীবনের সরাসরি যোগাযোগ। বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ ব্যতীত সমাজের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। ..... ।১৯৮৩–৮৪ সাল থেকে নবম–দশম শ্রেণীর শিক্ষাক্রমে কলা শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞানকে নৈর্বাচনিক করার ফলে। অধিকাংশ শিক্ষার্থী এখন বিজ্ঞান পাঠ করছে না । এই অবস্থা আমরা সন্তোষজনক বলে মনে করি না । সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নবম ও দশম শ্রেণীতে আবশ্যিকভাবে যাতে বিজ্ঞান পড়ান যায় সে বন্দোবস্ত করা অত্যাবশ্যক । (পৃঃ ৭৮)

সকলের জন্য বিজ্ঞান

বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নানা উপাদান, যথা পরীক্ষাগার, যন্ত্রপাতি, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, শ্রুতিদর্শন–উপকরণ, সহায়ক বইপত্র প্রভৃতির অপ্রতুলতা সম্বন্ধে আমরা সকলেই মোটামুটি সচেতন। মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির সহায়তায় এসব অভাব দূর করার ব্যাপক উদ্যোগ ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ থেকে (বিশেষত পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কার বিষয়ে) নানা উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরে 'সকলের জন্য বিজ্ঞান ' প্রবর্তন করার জন্য এসকল উদ্যোগ আরো বিস্তৃত ও গভীর হবার প্রয়োজন রয়েছে।

এক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের দিকে আজ বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছেঃ

১. বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। যথা— অনুসন্ধান; পরীক্ষা–নিরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; শুধু নানা বিষয়ে তথ্য আহরণ নয়, প্রকৃতির নানা কার্যক্রমের পদ্ধতি উপলব্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন। এসবের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন।

২. সকলের জন্য বিজ্ঞান প্রবর্তন করতে হলে সে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতি অবশ্যই জীবনভিত্তিক এবং শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাসংশ্লিষ্ট হতে হবে। এজন্য বিজ্ঞানের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিমার্জনা ও উন্নয়ন প্রয়োজন ।

৩. বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ের বিষয়টি সামনে আনতে হবে। এজন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তি ও উপযোগের সংযোগ যেমন

ঘটানো চাই, তেমনি প্রযুক্তির কল্যাণকর ও অকল্যাণকর দিক সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে হবে।

১৯৮৩ সালে ইউনেস্কো আয়োজিত এক বিশেষজ্ঞ সভায় 'সকলের জন্য বিজ্ঞান'–এর বিষয় নির্বাচনের নীতিমালা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

ক শিক্ষার্থী বিষয়টিকে তার দৈনন্দিন জীবনে জরুরি প্রয়োজন অথবা অর্থনৈতিক বা সামাজিক কারণে মূল্যবান মনে করবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার জগতে এর অর্থপূর্ণ প্রয়োগযোগ্যতা থাকবে।

খ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জীবনমান উন্নত হবে অথবা তার উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং এতে সমাজের ও জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা ঘটবে।

গ। এর ভিত্তি হবে শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা; তার বাস্তব জীবনের নানা উপাদানের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকবে এবং তার কাজে, অবসরে বা বাড়িতে এর সুস্পষ্ট ব্যবহারযোগ্যতা থাকবে।

ঘ। এতে অন্তর্ভুক্ত হবে এমন প্রাকৃতিক ঘটনা যা শিক্ষার্থীর মনে বিস্ময় ও উদ্দীপনা সঞ্চার করে।

ঙ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী কিছু প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবে এবং সে দক্ষতা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করতে শিখবে।

চ। বিষয়টি শিক্ষার্থীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং অহেতুক সেসবের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করবে না।

ছ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী জাতীয় উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবে।

জ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার পরিবেশের নানা সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে শিখবে এবং প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনপদ্ধতি আয়ত্ত করবে।[১]

এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগে প্রণীত আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞানের বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পুনর্বিবেচনা ও পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ।

'সকলের জন্য বিজ্ঞান' যে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়, এর অনেক উপাদান বিজ্ঞান ক্লাব, পত্র–পত্রিকা, আলোচনা–চক্র, শিক্ষা সফর, বিজ্ঞান মেলা প্রভৃতির মাধ্যমেও সঞ্চারিত হতে পারে । এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজ দেশের প্রতিটি মানুষের জীবনে এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করছে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের সব মানুষকেও 'সকলের জন্য বিজ্ঞান'–এর আওতায় আনা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে ।

---

[1] *Science for All* : Report of a Regional Meeting, Bangkok, 20-26 September 1983, Bangkok: Unesco Regional Office for Education in Asia and the Pacific, 1983, Pp. 20-21.

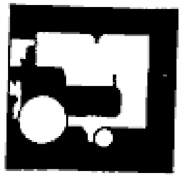

বিজ্ঞান, সমাজ ও শিক্ষার্থী

যেকোন দেশে একটি উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে অনেকগুলো বিষয় বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয় । তার মধ্যে শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা এবং যে সমাজ ও জনগোষ্ঠীতে তারা বাস করে তার চরিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞানের কি স্থান হবে তা নির্ধারণ করতে গেলে বিজ্ঞানের যে বিশেষ চরিত্র তার কথাও সমাজ ও শিক্ষার্থীর পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে ।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । এদেশ ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ হিসেবে এই অঞ্চলের দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী; কিন্তু এই ঐতিহ্যে— অন্তত সাম্প্রতিক কয়েক শতাব্দীতে— বস্তুজগতের চেয়ে হৃদয় ও অধ্যাত্মলোকের বিবেচনাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে মনে হয় । নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম বলেছেন, সপ্তদশ শতকে যখন ভারতে প্রেমের অর্ঘ্য হিসেবে তাজমহলের অপূর্ব মর্মর–প্রাসাদ নির্মিত হচ্ছিল, ইউরোপে তখন আরেকটি কীর্তিস্তম্ভ স্থাপিত হয়েছে— সেটি হল নিউটনের 'দ্য প্রিন্সিপিয়া' ; এর তুল্য কীর্তি মোগল ভারতে খুঁজে পাওয়া যায় না। (আবদুস সালাম, আদর্শ ও বাস্তবতা, ১৯৮৪, ইংরেজি, পৃঃ ৪৮)

আসলে এভাবেই ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে পাশ্চাত্যের 'উন্নত বিশ্ব' আর তথাকথিত 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশগুলির মধ্যে আজকের এই বিপুল বৈষম্য । প্রফেসর আবদুস সালাম অন্য এক জায়গায় বলেছেন ঃ

> আমাদের এই পৃথিবীতে স্পষ্টতই দু'শ্রেণীর মানুষ বাস করে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির ১৯৮৩ সালের হিসেব অনুযায়ী মানবজাতির এক–চতুর্থাংশ অর্থাৎ মোটামুটি ১১০ কোটি মানুষ উন্নত। এরা বাস করে পৃথিবীর দু'পঞ্চমাংশ ভূভাগে আর নিয়ন্ত্রণ করে পৃথিবীর ৮০ শতাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশের ৩৬০ কোটি মানুষ, যারা হল 'আল–মুস্তাদাফিন' অর্থাৎ বঞ্চিতের দল, তারা বাস করে বাকি তিন–পঞ্চমাংশ ভূভাগে । এই দু'শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পার্থক্যের মূল কারণ হল তাদের আকাঙ্ক্ষা, ... আর উদ্যোগ— যা আসে মূলত আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অধিকার ও প্রয়োগের তারতম্য থেকে ।

সমাজ বাস্তবতা

আজকের বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতার দিকে তাকালে বোঝা যায় এদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা ও প্রয়োগ কী বিশাল গুরুত্ব বহন করে । এদেশে মাত্র ১৪৪,০০০ বর্গ–কিলোমিটার এলাকায় গাদাগাদি হয়ে বাস করছে প্রায় এগার কোটি লোক। এমন ঘন জনবসতি (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় আটশ) বুঝি পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই । এমন ঘনবসতির কারণে প্রায় পুরো দেশ উর্বর পলিমাটির বদ্বীপ হলেও এখানে প্রতি বছর খাদ্যশস্যের চাহিদার প্রায় দশ–শতাংশের মতো ঘাটতি লেগেই আছে ।

এদেশের আরো কিছু বাস্তবতার কথা বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

ক. জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রামীণ; মোটামুটি সমান অংশ জীবিকার জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল ।

খ. শিল্পায়ন এখনো রয়েছে অতি প্রাথমিক পর্যায়ে । মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৪০ শতাংশ আসে কৃষি থেকে; শিল্প থেকে আসে মাত্র ১৫ শতাংশ ।

গ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী হলেও এখনো যথেষ্ট উঁচু; প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়ছে প্রায় ২.১ শতাংশ হারে । সক্ষম দম্পতিদের জন্মশাসন ব্যবহারের হার মাত্র ৩৪ শতাংশ ।

ঘ. গত তিন দশকে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে । কিন্তু ইতোমধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধিও ঘটেছে মোটামুটি একই হারে –– তার ফলে খাদ্যশস্যের ঘাটতিও রয়ে গিয়েছে একই রকম অর্থাৎ বার্ষিক চাহিদার প্রায় দশ শতাংশ ।

ঙ. দৈনিক গড়পড়তা ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ মাথাপিছু মাত্র ১৯০০ (বাঞ্ছিত মান ২৫০০); দেশের কোন কোন অঞ্চলে এই অঙ্ক মাত্র ১৪০০ । গত তিন দশকে মাথাপিছু ক্যালরি ও প্রোটিন গ্রহণের মান কেবলি নিচে নামছে।

চ. মাথাপিছু বার্ষিক মোট দেশজ উৎপাদন ১৮০ ডলার; এর মধ্যে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ দু'শতাংশের কম –– অর্থাৎ এ খাতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির গড়পড়তা বরাদ্দের মাত্র অর্ধেক ।

ছ. দেশে পাঁচ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৩০ শতাংশ । তবে এক্ষেত্রে শহর–গ্রাম ও পুরুষ–নারীর মধ্যে তারতম্যের অনুপাত মোটামুটি ২ঃ১ ।

জ. সারা দেশে স্বাস্থ্য–সুবিধে রয়েছে নাম মাত্র । জনগণের জন্য মাথাপিছু স্বাস্থ্য ও আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় বার্ষিক মাত্র দু'ডলার । সারা দেশে গড়পড়তা ৬,৫০০ লোকের জন্য রয়েছে মাত্র একজন ডাক্তার; কিন্তু তারাও প্রধানত বড় বড় শহরে কেন্দ্রীভূত ।

ঝ. জ্বালানি শক্তি ব্যবহারের মান সারা পৃথিবীর মধ্যে প্রায় নিম্নতম পর্যায়ে –– মাথাপিছু বছরে মাত্র ৫০ কেজি তেলের সমান (ভারত ও চীনের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ যথাক্রমে ২০০ ও ৫০০–এর ওপরে) ।

এসব তথ্য থেকে বোঝা যাবে সব ধরনের আর্থসামাজিক মানদণ্ডে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে একেবারে নিচের সারিতে । দেশের আজকের যে পশ্চাদপদতা তার মূলে অনেকটা স্থান জুড়ে আছে প্রায় দু'শতাব্দীর ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন এবং প্রায় দু'যুগের আধা–ঔপনিবেশিক পাকিস্তানী শাসন । ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পরের দু'দশকও কেটেছে নানা ধরনের রাজনৈতিক সংঘাত ও প্রলয়ঙ্করী বন্যা, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে । এদেশের মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী ও ঘাতসহ হলেও ব্যাপক নিরক্ষরতা, অস্বাস্থ্য, কুসংস্কার প্রভৃতি নানা কারণে তাদের জাতীয় উন্নয়নের উদ্যোগ ব্যাহত হয়েছে ।

শিক্ষার্থী কারা

সামাজিক বাস্তবতার যে চিত্র এখানে তুলে ধরা হল তা স্বভাবতই শিক্ষার্থীদের চরিত্রকে অনেকখানি প্রভাবিত করছে। বাপ–মা যেখানে নিরক্ষর এবং শিশু–কিশোরদের শ্রমও পরিবারের আয়ের জন্য নিয়োজিত, সেখানে স্বভাবতই শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রেরণের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে পড়ে । শিক্ষার্থীদের চরিত্রের বিশেষ কিছু দিক এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

ক. ০–১৬ বছর বয়সী শিশুরা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক । জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সীমিত আসনের ওপর বিপুল চাপ পড়ছে ।

খ. প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে (১–৫ শ্রেণী) শিক্ষার্থীর হার বয়ঃক্রমের ৭০ শতাংশ বলে সরকারীভাবে বলা হলেও কোন কোন গবেষণায় উপস্থিতির হার অনেক কম পাওয়া যায়; নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর হার বয়ঃক্রমের মাত্র ২৫ শতাংশ ।

গ. প্রাথমিক স্তরের সব শিক্ষার্থী ৩–৫ শ্রেণীতে 'পরিবেশ পরিচিতি' নামে একটি বিষয় পড়ে; নিম্নমাধ্যমিক স্তরে (৬–৮ শ্রেণী) পড়ে 'সাধারণ বিজ্ঞান'। তবে মাধ্যমিক স্তরে (৯–১০ শ্রেণী) মাত্র ৫০ শতাংশের মতো শিক্ষার্থী নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে ভৌতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান পড়ার সুযোগ পায়; অন্যরা এই স্তরে আদৌ বিজ্ঞানের কিছু শেখে না ।

ঘ. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রায় দশ শতাংশ পড়ে মাদ্রাসায় । এই স্তরের মাত্র ৮ শতাংশ মাদ্রাসায় নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে বিজ্ঞান পড়ার ব্যবস্থা আছে ।

ঙ. আশির দশকে মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। নতুন পাঠ্যবই ও শিক্ষক-নির্দেশিকা চালু হয়েছে; অধিকাংশ স্কুলে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। ব্যাপক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শনের মাধ্যমে কর্মমুখী ও অনুসন্ধানমূলক শিক্ষাদান পদ্ধতির ওপর জোর দেয়া হচ্ছে।

চ. গত দু'দশকে দেশে বিদ্যালয়ভিত্তিক ও এলাকাভিত্তিক বেশ কিছু বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠেছে। ১৯৭৮ সাল থেকে প্রতি বছর জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ ও বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে; তাতে স্কুল শিক্ষার্থী ও অন্যান্য উৎসাহী বিজ্ঞান ক্লাব কর্মীরা জেলা ও জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা বয়ঃসন্ধিকালের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী তাদের নিজেদের সম্বন্ধে এবং চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে গভীরভাবে কৌতূহলী; তাছাড়া তারা দেশ ও সমাজের জন্য কিছু অবদান রাখতে চায়। এসব শিক্ষার্থী সাধারণভাবে দেশের নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন এবং নানা সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়েও মোটামুটি অবহিত। তবে ঠিক কিভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের কাজে লাগানো যায় সে সম্বন্ধে তাদের অনেকেরই তেমন সুস্পষ্ট ধারণা নেই।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বাংলাদেশের সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সে কথা আজ আর ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নীতিতে (১৯৮৬) এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে (১৯৮৮) বলা হয়েছে ঃ

> ৮.১০ আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার আবির্ভাব অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে ঘটেছে; তার ফলে এদেশে এখনো বিজ্ঞান শিক্ষা, শিক্ষণ ও গবেষণার যথোপযুক্ত ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি। সমগ্র জনসমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞানমনস্কতা বিস্তৃত না হলে এই ঐতিহ্য গড়ে তোলা দুঃসাধ্য।
>
> ৮.১১ বিজ্ঞান শিক্ষা শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়, তার সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, হাতেকলমে কাজ ও অনুসন্ধান গভীরভাবে সম্পৃক্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এবং অভিভাবকগণ সম্যক অবহিত না হওয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষকগণও উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশের অভাবে তাঁদের শিক্ষাদানকার্যে যথেষ্ট অবদান ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন না। বিজ্ঞান শিক্ষা শুধু পুঁথির মাধ্যমে লাভ সম্ভব নয়, এজন্য শিক্ষকের যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষাদান অনেকাংশে অর্থহীন— এ সকল বিষয়ে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আজো যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন নন। (পৃঃ ১৪৪)

এসব বিবেচনা থেকে কমিশন বিদ্যালয়ের সকল স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার মান উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেন এবং মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য একে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গণ্য করার সুপারিশ করেন।

এই প্রসঙ্গে কতকগুলো প্রশ্ন বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। তার মধ্যে রয়েছে ঃ

১. বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থায় কি ধরনের বিজ্ঞান শেখানো প্রয়োজন? বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে কোন্ কোন্ ধরনের আচরণসমষ্টির ওপর জোর দেয়া বাঞ্ছনীয়? বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য যথোপযুক্ত বিষয়বস্তু কি হবে? বিজ্ঞানের অসংখ্য বিষয় থেকে সবচেয়ে জরুরি বিষয়গুলো কিভাবে নির্বাচন করা হবে?

২. যথার্থ শিক্ষার জন্য বিষয়বস্তুগুলোর বিন্যাস কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়? বিভিন্ন বিষয়ের জন্য কতটা সময় নির্দিষ্ট করতে হবে? শ্রেণীকক্ষে কি কি ব্যবহারিক কাজ অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন? তার মধ্যে কোন্গুলো শিক্ষার্থীরা নিজেরা করবে আর কোন্গুলো শিক্ষক শুধু প্রদর্শন হিসেবে করে দেখাবেন? কোন্ কোন্ কাজ শ্রেণীকক্ষের বাইরে করা যায়? কি কি উপকরণ প্রয়োজন হবে? শিক্ষাদান কিভাবে সবচাইতে কার্যকর করা যায়?

৩. শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ফলাফল মূল্যায়ন করার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা যায়? কতখানি দৃষ্টি দিতে হবে তথ্যের ওপর আর কতটা বিজ্ঞানের পদ্ধতির ওপর? কি কি ধরনের প্রশ্ন সবচেয়ে উপযোগী হবে? মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক কাজের ভূমিকা কি হবে?

আমাদের দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত সত্যের প্রতি এক ধরনের অন্ধ আনুগত্য রয়েছে, কাজেই বিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়ে যা লেখা হয়েছে তাকেই ধ্রুব জ্ঞান করে আত্মস্থ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্নশীলতার বিকাশ সহজ নয়; কেননা প্রশ্ন করতে গেলে কখনো মনে হতে পারে যে, শিক্ষকের প্রতি অমর্যাদার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। কাজেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে জিজ্ঞাসু মনের বিকাশ ঘটানো অনেকটাই নির্ভর করে শিক্ষকের নিজের গণতান্ত্রিক মনোভাব ও খোলা মন থাকার ওপরে।

আরেক বড় সমস্যা হল সাম্প্রতিক কালে বিস্ময়কর দ্রুততায় নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উদ্ভব ঘটছে। মাত্র বিগত কয়েক দশকের মধ্যে মানুষের কাছে এ ধরনের

বিষয়ে বিপুল পরিমাণ তথ্য অবারিত হয়েছেঃ বস্তুর মৌল উপাদান; পৃথিবীর কাছের এবং দূরের মহাকাশ; নানা নতুন জৈব প্রক্রিয়া যা থেকে উদ্ভব ঘটেছে জীবপ্রযুক্তি ও জিন-প্রকৌশলের; নতুন নতুন গুণাগুণযুক্ত বস্তু, যেমন অতিপরিবাহিতা; সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক্সের বিকাশ যা থেকে তথ্য প্রযুক্তি ও রোবট নির্মাণের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতি ঘটেছে; মানুষের ক্রিয়াকর্মের পরিবেশগত প্রভাব এবং পরিবেশের অবনতি রোধের ব্যবস্থা ।

এসব নতুন জ্ঞানের অনেক কিছু আজ উন্নত দেশগুলিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমেও স্থান পেতে আরম্ভ করেছে — যেমন জীবপ্রযুক্তি, কমপিউটার, নতুন গুণাগুণের বস্তু এবং অতিপরিবাহিতা । বলা বাহুল্য নতুন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে শিক্ষাক্রম যাতে শিক্ষার্থীদের সাধ্যের বাইরে অতিমাত্রায় ভারাক্রান্ত হয়ে না ওঠে সেজন্য তা থেকে কিছু কিছু পুরনো বিষয় বাদ দেয়া জরুরি । অথচ সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে এই কাজটি রীতিমতো কঠিন । এর একটি সমাধান অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হচ্ছে , সে হল শুধু বিজ্ঞানের তথ্যের ওপর নয় বরং ধারণা, মূলনীতি ও পদ্ধতিগত দক্ষতার ওপর জোর দেয়া । শিক্ষাদানের সময় এসব ধারণা, মূলনীতি ও পদ্ধতিগত দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হাতে-কলমে কাজের ওপর জোর দেয়া হয় ।

জাতিসংঘের উদ্যোগে সম্প্রতি '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে; সেই সঙ্গে অধিকাংশ দেশই আজ 'সবার জন্য বিজ্ঞান' প্রবর্তনের কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এই কর্মসূচিতে বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের অঙ্গ নয়, তরুণ ও বয়স্ক সবার জন্যই বিদ্যালয়-বহির্ভূত কর্মসূচিরও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় ।

আরেকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধারা হল বিজ্ঞানকে প্রযুক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত করা অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ । এক্ষেত্রে একটি শ্লোগান দেয়া হচ্ছে, 'উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি, প্রযুক্তির জন্য বিজ্ঞান' । এধরনের আরেকটি পদ্ধতিকে বলা হয় 'বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-সমাজ দৃষ্টিভঙ্গি'। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে আর্থসামাজিক উন্নয়ন শুধু যে অত্যন্ত জরুরি তা নয়, জাতির জন্য একটি জীবন-মরণ প্রশ্ন, সেখানে এধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ । আজকের দিনে সবচেয়ে জরুরি যা তা হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ ও সমগ্র জাতির জীবনমানের উন্নয়ন সাধন নিশ্চিত করা ।

বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য

এসব বিবেচনা থেকে বাংলাদেশ ও এধরনের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার মূল লক্ষ্য এভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে ঃ

ক. জনগণের আর্থসামাজিক চাহিদা মেটানো ও জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার উদ্ভাবন, বিকাশ ও বিস্তার ।

খ. দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য দক্ষ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জনশক্তি গড়ে তোলা ।

গ. দেশের জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা প্রসারের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির ব্যাপক ভিত্তি তৈরি এবং উদ্ভাবনমূলক প্রযুক্তি বিকাশ ও বিস্তারের অনুকূল বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি ।

বাংলাদেশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা প্রধান বলে বিবেচনা করা যেতে পারে তার মধ্যে পড়েঃ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, আশ্রয় ও বস্ত্র প্রভৃতি জনগণের মৌলিক চাহিদা মেটানো; দেশের সকল অংশের জনগণের জন্য সমান সুযোগসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান; ব্যক্তির সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ ও আইন-শৃঙ্খলার প্রতি সম্ভ্রম সৃষ্টি; দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও সংযত ব্যবহার; পরিবেশের গুণগত মান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যক্তি ও সমাজের জীবনমানের উন্নয়নে প্রয়োগ ।

এখন প্রশ্ন হল ঃ এসব সমস্যার সমাধানে এবং কর্মসূচির বাস্তবায়নে বিজ্ঞান শিক্ষা কি ধরনের সহায়তা করতে পারে? পারলে কিভাবে পারে? সেজন্য শিক্ষার্থীদের কি ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের পদক্ষেপ নিতে হবে? এ সম্পর্কে নিচের প্রত্যাশাগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

- ব্যাপকভিত্তিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাক্ষরতা সৃষ্টি;
- বিজ্ঞানের ভূমিকা এবং কাজের জগতের সঙ্গে পরিচয়;
- উন্নয়ন এবং জীবনমানের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন;
- আগ্রহ, মুক্ত মন, প্রশ্নশীলতা ও অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি;
- সমস্যা নিরূপণ, সমাধানের দক্ষতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা গড়ে তোলা;
- দলবদ্ধভাবে কাজ করার অভ্যাস গঠন;
- মানবিক ও বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধের বিকাশ;
- প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও সংযত ব্যবহার ।

এসব প্রত্যাশা পূরণের বিষয় সামনে রেখে বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা যেতে পারে । এসব লক্ষ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে হয়তো ভাষার কিছুটা তারতম্য হতে পারে, কিন্তু নিচের লক্ষ্যগুলো অবশ্যই বিবেচনার অপেক্ষা রাখেঃ

১. প্রাকৃতিক নানা ঘটনা এবং পরিবেশ সম্পর্কে কৌতূহল ও আগ্রহ সঞ্চার;
২. প্রকৃতি ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণের দক্ষতা গড়ে তোলা;
৩. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের সামর্থ্য সৃষ্টি;
৪. যুক্তিপূর্ণ ও বিশ্লেষণমূলক চিন্তার ক্ষমতা অর্জন;
৫. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজের এবং সমাজের অন্যদের জীবনমানের উন্নয়নে সহায়তা;

৬. বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার সমাধান;

৭. বিজ্ঞান শিক্ষা ও উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা;

৮. এমন বৃত্তিমূলক কুশলতা অর্জন যাতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে কোন উৎপাদনমূলক জীবিকা অবলম্বন করতে পারে;

৯. বাঞ্ছনীয় ও কল্যাণকর ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ গঠন।

বলাবাহুল্য এসব লক্ষ্যকে যথোপযুক্ত শিক্ষা কার্যসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়নের মধ্যেই এদের প্রকৃত সার্থকতা । সেজন্য উপযুক্ত বিষয় নির্বাচন যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণ এবং শিক্ষাদান কর্মের ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন ।

লক্ষ্য নির্ধারণ যে কোন শিক্ষা কার্যসূচির শুধু একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র । সেইসঙ্গে বিষয়বস্তু ও আচরণগত দিক, বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও শিক্ষাদান কর্মের ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়নের প্রসঙ্গও বিবেচনায় রাখতে হবে । এক্ষেত্রে আরো কিছু বিষয় বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন ঃ

ক. বিজ্ঞানের বিশেষ চরিত্রের কথা শিক্ষাদানকালে সবসময় মনে রাখতে হবে । যেমন, অনুসন্ধানের মনোভঙ্গি, পরীক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপলব্ধি, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা । এজন্য পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাও যথাযথ হওয়া প্রয়োজন ।

খ. বিজ্ঞান শিক্ষা সার্থক হতে হলে তার ভিত্তি হওয়া চাই শিক্ষার্থীদের এবং তাদের পারিপার্শ্বিক সমাজের বাস্তব জীবন। এজন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকতে হবে । সমাজ, শিক্ষার্থী ও জ্ঞানের জগতে আজ দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে । তাই এসব পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষাক্রমের সংস্কার ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্রমাগত উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে হবে।

গ. বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানের সঙ্গে প্রয়োগের, বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির ক্রমাগত যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে আজকের পৃথিবীতে প্রযুক্তির কল্যাণকর ও অকল্যাণকর দু'ধরনের প্রভাবের বিষয়েই শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আধুনিক বিশ্বে এমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, মাধ্যমিক স্তরে শুধু শিক্ষার্থীদের একাংশের মধ্যে একে আর আবদ্ধ রাখা যায় না । দেশের নানা উন্নয়ন প্রকল্পের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে সমগ্র জনসমাজে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা বিস্তারের ওপর । এজন্য সারা দেশে মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষার্থীর কাছে বিজ্ঞান শিক্ষা যত দ্রুত লভ্য করে তোলা যায় দেশের জন্য ততই মঙ্গল ।

পরিবেশ ও শিক্ষা

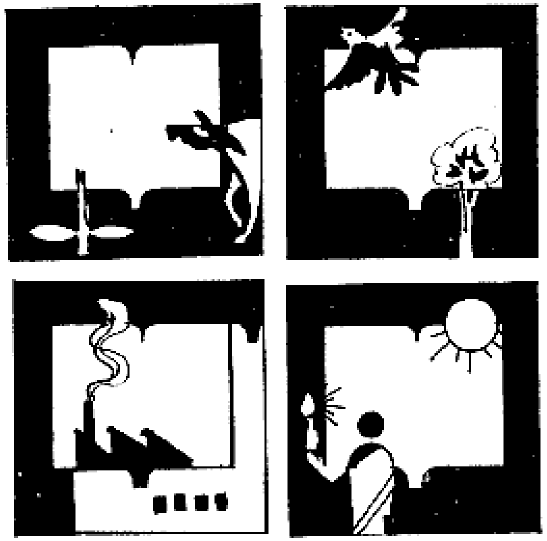

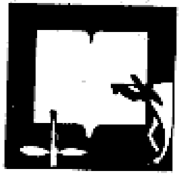

পরিবেশ ও জীবজগৎ

আর মাত্র ক'বছর পরই আমরা বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকে পড়ব। এই বিশ শতক মানুষের ইতিহাসে এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কাল বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। গত দশ হাজার বছরের সভ্যতায় মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে, জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যে যতটা না এগিয়েছে, এই মাত্র এক শতাব্দীতে এগিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, কৃষি সভ্যতার উদ্ভবের শুরুতে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল মাত্র চল্লিশ লাখের মতো। প্রায় দশ হাজার বছর ধরে মানুষের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বিশ শতকের শুরুতে হয়েছিল মোটামুটি ১৬৫ কোটি; অথচ মাত্র গত এক শতাব্দীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা দু'শ', তিনশ', চারশ', পাঁচশ'র অঙ্ক পেরিয়ে আজ ছ'শ' কোটির দিকে এগিয়ে চলেছে। আমাদের মতো অতি দরিদ্র দেশেও এই এক শতাব্দীতে মানুষের গড়পড়তা আয়ু বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

এই অগ্রগতির জন্য মানুষকে অবশ্য বেশ দামও দিতে হয়েছে। কত দাম দিতে হয়েছে সেটা আগে তেমন স্পষ্ট বোঝা যায় নি, কিন্তু মাত্র গত ক'বছরে এবিষয়ে আমরা অনেক কথা জেনেছি। আজ আমরা বুঝেছি যে, নিজের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার জন্য মানুষ তার চারপাশের প্রকৃতি আর পরিবেশ থেকে নানা সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছে; তার অতিলোভ আজ পরিবেশকে নিংড়ে, শুষে ছিবড়ে করে ফেলছে। তার ফলে এককালে যে পরিবেশ ছিল নানা সম্পদে পূর্ণ তা আজ হয়ে উঠছে রিক্ত; যে প্রকৃতি ছিল প্রাণের ঐশ্বর্যে ভরপুর তা আজ প্রাণশূন্য হয়ে পড়ছে। অবশেষে আমরা এমন এক অবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছি যখন পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে কিনা তা নিয়েই সংশয় দেখা দিচ্ছে।

স্থায়ী ও চলতি পুঁজি

আমাদের আজকের যে সভ্যতার ঐশ্বর্য তার সব কিছুই গড়ে উঠেছে চারপাশের প্রকৃতির দান দু'হাতে গ্রহণ করে। প্রকৃতির যে সম্পদ তা মোটামুটি দু'ধরনের। এক হল তার স্থায়ী পুঁজি — এর মধ্যে পড়ে নানা রকম খনিজ, যেমন কয়লা, তেল, লোহা, তামা ইত্যাদি; আরেক তার রোজকার তৈরি সামগ্রী — যেমন আলো, হাওয়া, পানি, গাছপালা, ফুল-ফল-ফসল। এককালে মানুষ প্রকৃতি থেকে নিত তার রোজকার তৈরি নানা উপহার, তাতে প্রকৃতির পুঁজিতে হাত পড়ত না। কিন্তু গত কয়েকশ' বছরে মানুষ

পৃথিবীর স্থায়ী পুঁজি থেকে টানছে বিপুলভাবে । আর রোজকার তৈরি সামগ্রীও নিচ্ছে এমনভাবে যে, প্রকৃতি সে সব জিনিস তৈরির ক্ষমতাই ক্রমে ক্রমে হারিয়ে ফেলছে ।

মানুষ যত শক্তিশালীই হোক, এই পৃথিবীতে সে একা স্বয়ম্ভূ হয়ে বাস করতে পারে না । তার চারপাশে রয়েছে নানা প্রাকৃতিক বস্তুর সমাবেশঃ পৃথিবীর আলো-হাওয়া, গাছপালা, মাটি-পাথর, পশুপাখি— এ সব কিছু মিলেই হল আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ । মানুষ এই পরিবেশেরই অংশ । শুধু অংশ বললে বোধ হয় সবটা বলা হয় না । এই পরিবেশ থেকেই মানুষের সৃষ্টি, আবার তাকে বাঁচিয়েও রাখে তার চারপাশের এই পরিবেশ । আর এজন্যই পৃথিবীর বাইরে আর কোন গ্রহ-নক্ষত্রে বা মহাকাশের আর কোন প্রান্তে ভিন্ন ধরনের পরিবেশে আজকের মানুষের পক্ষে টিকে থাকা দুঃসাধ্য ।

আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশের রয়েছে আরো দুটো গুণ । একঃ পরিবেশ যে শুধু আমাদের রোজকার জীবন যাপনের নানা উপাদান যোগায় তা নয়, মানুষের সভ্যতার এগিয়ে যাবার ধারাকেও নিয়ন্ত্রণ করে । আমাদের চারপাশে যেসব জিনিস আছে তা না থাকলে সভ্যতার এগিয়ে যাওয়া হবে শক্ত । আর দুইঃ পরিবেশের নানা উপাদান পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল । এই নির্ভরশীলতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে পরিবেশের এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য । কোথাও এই ভারসাম্য বিনষ্ট হলে সমগ্র পরিবেশের কাঠামোতেই বিপর্যয় দেখা দিতে পারে ।

এককালে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ছিল কম । তখন প্রাকৃতিক পরিবেশে যেসব পরিবর্তন ঘটত সেগুলো প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটত । মানুষের ক্রিয়ার ফল ছিল সেখানে সামান্যই । আজ পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে । মানুষ নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিতে নানা পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে । তার ফলে কোথাও কোথাও সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হতে আরম্ভ করেছে । কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভারসাম্য এমনভাবে ভেঙে পড়ছে যে, তাতে প্রকৃতিতে নানা বড় রকম ওলট-পালট ঘটতে আরম্ভ করেছে । সাম্প্রতিককালে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলের দীর্ঘকালীন প্রবল খরা আর বাংলাদেশের মারাত্মক প্লাবন এমনি প্রাকৃতিক ভারসাম্যে ওলট-পালট ঘটারই দৃষ্টান্ত ।

এমনি নানা ধরনের বড় রকম পরিবর্তন আজ প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘটে চলেছে । এসব পরিবর্তন কম মাত্রায় হলে প্রকৃতি তার আপন নিয়মে সে সব সামলে নিতে পারত, তাতে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য তেমন নষ্ট হত না । কিন্তু এসব আজ ঘটছে ব্যাপকভাবে । যেমন, সারা পৃথিবীতে বনজঙ্গলের পরিমাণ আজ খুব দ্রুতহারে কমে যাচ্ছে । বনজঙ্গল কমে যাবার ব্যাপারটা আমাদের দেশে আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি । বনজঙ্গল কমে যাওয়ায় জীবজন্তুর ওপর, আবহাওয়ার ওপর তার বড় রকম প্রভাব পড়ছে।মানুষের সংখ্যা আর কলকারখানা বাড়ার ফলে পৃথিবীতে জীবাশ্ম জ্বালানি (যেমন, কয়লা, তেল, গ্যাস) পোড়ানোর পরিমাণও খুব দ্রুতগতিতে বাড়ছে । শুধু বিশ শতকের মধ্যেই পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে তিনগুণের মতো । কিন্তু এই সময়ে পৃথিবীতে কয়লা, তেল, গ্যাস এসব জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ বেড়েছে পনেরগুণের ওপর । এত বেশি জ্বালানি পোড়াবার ফলে বায়ুমণ্ডলের দূষণ বাড়ছে দ্রুত, কারবন ডাই-অকসাইডের পরিমাণ আর তাপমাত্রাও বাড়ছে সেই সঙ্গে ।

আমাদের চারপাশে প্রকৃতিতে যদি ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটতে থাকে তাহলে গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ সে সব পরিবর্তনের সঙ্গে অনেকখানি পরিমাণে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে । কিন্তু এসব পরিবর্তন যদি খুব দ্রুততালে ঘটতে থাকে তাহলে গাছপালা, পশুপাখি তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না—তারা নির্বংশ হতে আরম্ভ করে । মানুষও তখন আর প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না । এমন কি শেষ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই পৃথিবীতে টিকে থাকাও শক্ত হয়ে উঠতে পারে ।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য চারপাশে গাছপালার প্রয়োজন, পশুপাখির প্রয়োজন । এসব যদি না থাকে তাহলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা হয়ে উঠবে কঠিন । কিন্তু আজ যেভাবে আমাদের চারপাশে অপরিকল্পিতভাবে নানা পরিবর্তন ঘটে চলেছে তাতে ধ্বংস হচ্ছে গাছপালা, পশুপাখি । ধ্বংস হচ্ছে ফসলের জমি, ভরাট হয়ে যাচ্ছে নদী-নালা, দূষিত হয়ে উঠছে নদী আর হ্রদের পানি, চারপাশের বায়ুমণ্ডল । বিষাক্ত হয়ে উঠছে চারপাশের পরিবেশ । এমন অবস্থা যদি দীর্ঘকাল চলতে থাকে তাহলে বন্যা, খরা এসব দুর্যোগ বাড়বে বই কমবে না ।

জীবজগতের বৈচিত্র্য

বিশ শতকে পৃথিবীতে নগরায়ণ ঘটছে দ্রুতগতিতে । এই শতকের শুরুতে পৃথিবীতে নগরবাসী মানুষের সংখ্যা ছিল মাত্র দশ শতাংশের মতো; দু'হাজার সালে সে হার গিয়ে দাঁড়াবে পঞ্চাশ শতাংশের কাছাকাছি । বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই বিশ শতকে নগরায়ণের হার বেড়েছে আরো বেশি— মাত্র এক শতাংশ থেকে হয়েছে প্রায় বিশ শতাংশ । নগরায়ণের এই রুদ্ধশ্বাস গতি একাধারে রিক্ত করে তুলছে গ্রামাঞ্চল আর বনাঞ্চলকে; সেই সঙ্গে বিপন্ন করছে দুনিয়াজোড়া জীবজগতের বৈচিত্র্য ।

আসলে শুধু তো নগরবাসীর সংখ্যা বাড়ছে না; বাড়ছে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যাই। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় একশ' কোটি। আর এ সময়েই পৃথিবীতে জীবজগতের ছিল সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্য । জীবজগতের বৈচিত্র্য মানে হল নানা বিচিত্র প্রজাতির উদ্ভিদ, নানা বিচিত্র প্রজাতির প্রাণী । এত অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ আর প্রাণীকে মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করতে থাকে তার জীবনযাত্রা পদ্ধতির উন্নয়নের কাজে ।

আজ এই বিশ শতকের শেষে এসে মানুষের সংখ্যা পাঁচশ' কোটির অঙ্ক ছাড়িয়ে প্রায় ছ'শ' কোটি ছুঁই ছুঁই করছে । কিন্তু সেই সঙ্গে দুনিয়া জুড়ে মানুষের অপ্রতিহত পদসঞ্চারের ফলে জীবজগতের বৈচিত্র্য কমে আসছে । পৃথিবীতে আজ উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অন্যান্য ধরনের জীবপ্রজাতির সংখ্যা প্রায় এক কোটি । কারো কারো মতে

এই সংখ্যা তিন কোটিও হতে পারে । এর মধ্যে মাত্র পনের লক্ষ প্রজাতির হদিস বিজ্ঞানীরা করতে পেরেছেন । বাকি অধিকাংশ প্রজাতি রয়েছে বিজ্ঞানীদের অগোচরে । অথচ এটা আমরা জানি যে, গত দু'শ বছরে অব্যাহত গতিতে প্রজাতির সংখ্যা কমছে । বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী এর মধ্যে দু' শতাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং এক শতাংশের ওপর পাখি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে । আরো অন্তত দশ শতাংশ পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রজাতি আজ বিলুপ্তির মুখোমুখি। এভাবে চললে আগামী তিন দশকের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ৫ থেকে ১৫ শতাংশ প্রজাতি; একুশ শতকের মাঝামাঝি পৌছবার আগেই নিশ্চিহ্ন হবে প্রায় ২৫ শতাংশ প্রজাতি । সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হবে প্রায় আড়াই লক্ষ সপুষ্পক উদ্ভিদ প্রজাতির এক-চতুর্থাংশ ।

জীবজগতের সব ধরনের উদ্ভিদ আর প্রাণীরই বেঁচে থাকবার অধিকার রয়েছে । প্রতিটি প্রজাতি অন্যান্য নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঙ্গে এবং তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে টিকে থাকে । জীবজগতের বৈচিত্র্য এ পৃথিবীকে আরো বেশি বাসযোগ্য করে তোলে । এর ফলে শুধু যে চারপাশের পরিবেশের রাসায়নিক ভারসাম্য রক্ষা হয় তাই নয়, মাটি ও পানির ভারসাম্যও বজায় থাকে । কাজেই কোন একটি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটলেও অন্যান্য প্রজাতির জীবনযাত্রার ওপর তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে ।

বলা বাহুল্য জীবজগতের বৈচিত্র্য এ পৃথিবীর এক অমূল্য সম্পদ । আমাদের সকল খাদ্য এবং অধিকাংশ কাঁচামাল জীবজগৎ থেকেই আসে । কৃষিজাত পণ্য ছাড়াও বিপুল পরিমাণ ওষুধপত্র এবং শিল্পজাত বস্তু উৎপন্ন হয় জীবজগৎ থেকে । এসব ব্যবহারিক চাহিদা পূরণ ছাড়াও জীবজগৎ আমাদের যে বিপুল সাংস্কৃতিক ও মনোগত চাহিদা মেটায় তার দামও কম নয় ।

প্রজাতির বিলুপ্তি ও সংরক্ষণ

নানা জীব প্রজাতির বিলুপ্তি শুধু যে আমাদের কালের বা আমাদের প্রজন্মের জন্যই ক্ষতিকর তা নয়, আগামী দিনের সকল প্রজন্মের জন্য তা বিপুল ক্ষতির বোঝা হয়ে দাঁড়াবে । যেসব প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হচ্ছে তার অনেকগুলোরই রয়েছে খাদ্য, ওষুধ বা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে নানা অজানা সম্ভাবনা । পরিবেশের অবনতির ফলে যেসব বাস্তু-সংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেগুলো শুধু নানা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য নয়, মানুষের বসবাসের জন্যও অনুপযোগী হয়ে উঠছে । নানা বিচিত্র প্রজাতির ফসলের পরিবর্তে মাত্র কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির ফসলের ওপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হবার ফলে ভবিষ্যতে উন্নত গুণাগুণযুক্ত ফসল সৃষ্টির সম্ভাবনা নষ্ট হচ্ছে । মাত্র গুটিকতক প্রজাতির চাষ চালু হওয়ায় কোথাও কোথাও রোগের বা পোকার আক্রমণে বিশাল এলাকার সব ফসলই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ।-

কিন্তু এই যে প্রজাতির বিলুপ্তি এবং জীবজগতের বৈচিত্র্য বিনষ্ট হওয়া এর জন্য দায়ী কে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে উত্তরটা তেমন জটিল নয় । আগের চেয়ে আজ অনেক ব্যাপক আকারে বনজঙ্গল কেটে বা পুড়িয়ে ধ্বংস করা হচ্ছে । উদ্ভিদ বা প্রাণী অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করে নিঃশেষ করা হচ্ছে । কীটনাশক, আগাছানাশক প্রভৃতি রাসায়নিক বস্তু বেহিসেবীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে; বেহিসেবী মাছধরা, অতিরিক্ত রকম বায়ু ও পানি দূষণ — এ সব কিছুকেই কারণ বলে নির্দেশ করা যেতে পারে ।

কিন্তু একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে আসলে এসবের পেছনে রয়েছে মানুষের বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধি, বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক প্রবণতা । মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাঠ, আঁশ, খাদ্যশস্য, বন্যপ্রাণী প্রভৃতি নানা পণ্যদ্রব্য ভোগের চাহিদা বাড়ছে । অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প রচনায় নানা ধরনের খনিজদ্রব্য, জ্বালানি বা অন্য বস্তুসম্পদের তুলনায় জীবসম্পদের আর্থিক মূল্য কম ধরা হচ্ছে । আবার অন্যদিকে জীবসম্পদ ধ্বংস করে রপ্তানি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ বিপুল মুনাফা করছে, অথচ তার ফলে স্থানীয় জনগণ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । সমাজ জীবনে অনেক জীবপ্রজাতির প্রভাব সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এখনও সীমাবদ্ধ । অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোও নেহাত দুর্বল ও অক্ষম ।

অনেক সময় উত্তর-দক্ষিণের অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমস্যাটিও এখানে প্রভাব বিস্তার করে । পৃথিবীর জীবপ্রজাতির বেশিরভাগের বাস দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত নিরক্ষীয় অঞ্চলে । অথচ এসব সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে প্রধানত উত্তরাঞ্চলের শিল্পোন্নত দেশগুলোর মানুষের ভোগের জন্য । দক্ষিণের দেশগুলোতে সস্তা শ্রম, কাঁচামালের কম দাম, অসম মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগ প্রভৃতি কারণে দক্ষিণের এসব দেশের অর্থনীতি যেমন ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে , তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের পরিবেশের সম্পদ । এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য তাই যেমন আশু এবং আপাতদৃষ্ট সমস্যাগুলোর দিকে তাকাতে হবে, তেমনি এর গভীরে যে সব অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা রয়েছে সেগুলোর কথাও ভাবতে হবে । আর সেই বিশ্বব্যাপী সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করে তার বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে । জীবজগতের বৈচিত্র্য ধ্বংস হলে তা শুধু গ্রামাঞ্চলের বা বনাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করবে না, নগরবাসীসহ সমগ্র জনসমাজের ওপরই আগামী দিনে এক বিষম বিপদ ঘনিয়ে আসবে।

শিক্ষা ও পরিবেশ-চেতনা

দুনিয়া জুড়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ যেমন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন এর আগে আর কখনো হয় নি । সাম্প্রতিককালে আফ্রিকার খরা এবং বাংলাদেশের প্লাবন ও ঘূর্ণিঝড় অসাধারণ নাটকীয় বিপর্যয়ের রূপ নিয়েছে । লক্ষ লক্ষ মানুষ এসবের ফলে চরম দুর্গতির মুখোমুখি হয়েছে । কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল এধরনের বিপর্যয়কে আজ আর শুধু আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে গণ্য করা যাচ্ছে না; মনে হচ্ছে এসব সারা দুনিয়া জুড়ে পরিবেশের ভারসাম্য গুরুতরভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ারই লক্ষণ মাত্র ।

পরিবেশের সমস্যার কথা আজ লোকের মুখে মুখে ফেরে । বাংলাদেশে ১৯৮৮ সালের বন্যায় থই থই পানিতে তিন–চার কোটি লোক গৃহহারা হয়েছে । ১৯৯১–এর প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণ হারিয়েছে কয়েক লক্ষ মানুষ । ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা ছাড়াও এমনিতেই বিশুদ্ধ খাবার পানি যেন ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে । চাষের জমিতে আর আগের মতো ফসল ফলতে চায় না । নদীর দূষিত পানিতে কোথাও কোথাও অসংখ্য মাছ মরে ভেসে উঠছে । জ্বালানী কাঠ ক্রমেই চলে যাচ্ছে লোকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে । চারপাশের হাওয়া আচ্ছন্ন হচ্ছে ধোঁয়া আর ধুলোয় । — সব মিলিয়ে দুনিয়াটা যেন ক্রমেই হয়ে উঠছে মানুষ বাসের অযোগ্য ।

এধরনের সমস্যা যেমন দেখা দিচ্ছে উন্নত দেশগুলোতে তেমনি দেখা দিচ্ছে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেও । নানা দেশের মধ্যে হয়তো সমস্যার ধরনে কিছুটা হেরফের আছে । যেমন ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকায় প্রধান পরিবেশগত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অম্লবৃষ্টি; অথচ নেপাল বা বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞরা গাছপালা উজাড় হওয়াকে চিহ্নিত করছেন পরিবেশের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হিসেবে ।

সাধারণ মানুষকেও জানতে হবে

অনেক জটিল সমস্যা আছে যার ভেতরের কথা শুধু বিশেষজ্ঞরাই জানেন । পরিবেশের সমস্যা সম্পর্কেও একথাটা খাটে । বছর বছর বন্যা হচ্ছে এবং তাতে মানুষের দুর্গতি বাড়ছে এটা সবাই দেখছে । কিন্তু বন্যা যে ঠিক কেন হচ্ছে তা সাধারণ মানুষ সবাই জানেও না, বোঝেও না । কিংবা নদীতে কখনো কখনো মাছ মরে ভেসে উঠছে; কিন্তু কেন মরছে সেটা জানার জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য প্রয়োজন ।

এমন এককাল ছিল যখন সাধারণ মানুষ এসব সমস্যা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাত না; তাদের মাথা ঘামাবার দরকারও হত না হয়তো । চারপাশের পরিবেশে যখন কোন পরিবর্তন ঘটত তখন তারা যদি বা দেখতে পেত সে সব পরিবর্তন, বুঝত না তার কারণ । কখনো তারা ভাবত এসব যা ঘটবার তাই ঘটছে — অর্থাৎ এসব নিয়ে তার করার নেই কিছু । নিয়তির ওপর হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকাই তারা শ্রেয় মনে করত ।

কিন্তু আজ অবস্থা পালটে যাচ্ছে । ক্রমেই পরিবেশের অনেক পরিবর্তন চলে যাচ্ছে মানুষের সহ্যের সীমার বাইরে । পরিবেশের সমস্যা মানুষের জীবনকে শুধু অতিষ্ঠ করে তুলছে না, তার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ছে । আর সেইসঙ্গে বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রকৃতিতে আর পরিবেশে যেসব পরিবর্তন ঘটছে সেগুলোর অনেকটাই মানুষের তৈরি এবং যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।

অনেক ক্ষেত্রেই সে নিয়ন্ত্রণ আবার শুধু গুটিকতক বিশেষজ্ঞের কাজ নয় । ক্ষতিকর পরিবর্তনের কারণগুলো ঠেকাতে হলে সারা দেশের মানুষকেই ব্যাপারটা বুঝতে হবে, সে কাজে হাত লাগাতে হবে । নোংরা পরিবেশ থেকে অসুখ–বিসুখ সৃষ্টি হয় সেটা লোকে বহুকাল থেকে জানে । কিন্তু জীবাণুতত্ত্বের কথা মানুষ জেনেছে সাম্প্রতিককালে । নানা রোগ যে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু থেকে নানাভাবে ছড়াতে পারে এটা না জানলে রোগ প্রতিরোধ করা শক্ত হয়ে উঠতে পারে । আর একথা শুধু দু'চারজন জানলেও চলবে না, সমগ্র সমাজ যদি সচেতন না হয় তাহলে বিশুদ্ধ হাওয়া, বিশুদ্ধ পানি বা পরিচ্ছন্ন রোগমুক্ত পরিবেশ রক্ষা করা কঠিন ।

তেমনি গাছপালা কেটে তার কাঠ মানুষ ঘরবাড়ি তৈরির জন্য, চুলো জ্বালাবার জন্য ব্যবহার করছে বহু হাজার বছর ধরে । কিন্তু আজ বিজ্ঞানীরা বলছেন, গাছপালা কমে যাওয়া দেশের আবহাওয়া বদলে যাবার একটা বড় কারণ । এ থেকেই হয়তো কখনো ঘটছে প্রবল খরা আবার কখনো সর্বগ্রাসী প্লাবন বা ঝড় । — এসব কথা আজ জানা প্রয়োজন দেশের সব মানুষের । জেনে এর প্রতিকার করার জন্য দেশময় গাছপালা লাগাবার, বন তৈরির ব্যবস্থা নিতে হবে । সেই সঙ্গে লোকের রান্নাবান্নার জন্য এবং অন্যান্য কাজের জন্য বিকল্প জ্বালানির ব্যবস্থাও থাকা চাই ।

সমস্যা ক্রমেই জটিল হচ্ছে

এই পৃথিবীতে মানুষ এসেছে অন্তত আজ থেকে বিশ লাখ বছর আগে । মানুষের একটা বিশেষ গুণ এই যে, সে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে, তেমনি নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে বদলাতেও পারে। দীর্ঘ সময় ধরে মানুষ নানাভাবে প্রকৃতিকে বদলে চলেছে। বন–জঙ্গল কেটে, জলা জায়গা ভরাট করে কোথাও সে দিগন্তজোড়া ফসলের খেত সৃষ্টি করেছে, কোথাও বা বিশাল সব নগর–বন্দরের পত্তন করেছে; পাহাড়–নদী ডিঙিয়ে অসংখ্য পথঘাট সৃষ্টি করে যাতায়াত করে তুলেছে সহজ, বড় বড় কলকারখানা বসিয়ে তৈরি করেছে অজস্র নতুন নতুন বস্তুসামগ্রী ।

বহু লক্ষ বছর ধরে মানুষ চারপাশের প্রকৃতিকে যতটা বদলেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বদলেছে আঠার শতকের ইউরোপে শিল্প–বিপ্লবের পর থেকে— অর্থাৎ মাত্র গত

দু'শ' বছরে । এ সময়ে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে তার সংখ্যা, আর সেই সঙ্গে প্রকৃতির সম্পদের ওপর মানুষের চাহিদা । একসময় যা ছিল প্রকৃতির অকৃপণ দান তা যেন আজ মানুষ দু'হাতে লুটে নিতে আরম্ভ করেছে। তার ফলে বিপর্যস্ত হচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্য —তার দেবার ক্ষমতা । কোথাও কোথাও সেই করুণাময়ী প্রকৃতি রিক্ত, বিকৃত হয়ে যেন ক্রমেই ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করছে ।

এসব সমস্যার কথা আজ এখনই ভাবতে হবে সবাইকে, জানতে হবে সবাইকে; তারপর প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে সারা পৃথিবীতে একযোগে । পরিবেশের সমস্যা আজ আর কোন দেশের সীমানায় আবদ্ধ হয়ে নেই — হয়ে দাঁড়িয়েছে এক দুনিয়াজোড়া সমস্যা । কাজেই সারা দুনিয়ার মানুষকে এ সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে । যেমন বাংলাদেশের বন্যা সমস্যার সমাধানের জন্য শুধু দেশের ভেতরে নানা পদক্ষেপ নিলেই চলবে না, অনেক কিছু নির্ভর করছে প্রতিবেশী দেশগুলো —নেপাল, ভুটান, ভারত, মায়ানমার কি করছে তার ওপর ।

শিক্ষা–ব্যবস্থায় পরিবেশ

একটি বড় পদক্ষেপ হতে পারে সবদেশে শিক্ষা–ব্যবস্থায় পরিবেশের ওপর জোর দেয়া। এক্ষেত্রে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে বেশ কিছুটা কাজ হয়েছে । ১৯৭৪ সালে কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশন পরিবেশবিষয়ক বিবেচনাকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেবার কথা বলেছিলেন । সে অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণী থেকে পরিবেশ–সম্পর্কিত বিষয় নবম–দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণীতেই কম–বেশি পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । এসব বিষয় ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ–চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে ।

অবশ্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে পরিবেশ–সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করলেই যে সমস্যার সমাধান হবে তা বলা যায় না । তাছাড়া নানা কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ–সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য দেখা দিতে পারে । ১৯৮৩ সালে ঢাকা শহরের ন'টি বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর ১,০০০ ছাত্রছাত্রীর ওপর একটি গবেষণা চালান হয়। তিনটি ছিল বালিকা বিদ্যালয়, তিনটি সহশিক্ষা বিদ্যালয় এবং তিনটি বালক বিদ্যালয়। তিন ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মনোভাবের যে গড়মান পাওয়া যায় তা সারনীতে দেখানো হল। এ থেকে দেখা যায় পরিবেশ–সংক্রান্ত বিষয়ে বালিকাদের মনোভঙ্গি বালকদের চেয়ে উঁচু মানের; পরিসংখ্যানগতভাবেও এই পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ।

বলা বাহুল্য বালক–বালিকা উভয় ক্ষেত্রেই পরিবেশ চেতনার মান উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং সেজন্য উন্নত শিক্ষক–প্রশিক্ষণ, শিক্ষাসহায়ক উপকরণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা জরুরি প্রয়োজন । আর এই প্রয়োজন যে শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরই তা নয়; সমগ্র জনসমাজের পরিবেশ–বিষয়ক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন

বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সম্পর্কিত মনোভাবের গড়মান

বিদ্যালয়ের ধরন	শিক্ষার্থী সংখ্যা	গড়মান	আদর্শ–বিচ্যুতি
বালিকা	৪২৫	১০.০২	০.৩৯
সহশিক্ষা	২২২	৯.৯৫	০.৮১
বালক	৩৫৩	৯.৮৩	০.০৭

সূত্রঃ রাবেয়া খানম ও ইকবাল আজিজ মুত্তাকী, 'ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি মনোভাব,' বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা, বৈশাখ–আশ্বিন, ১৩৯১, পৃঃ ৭৩ ।

ধরনের তথ্য–যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো যেতে পারে । ১৯৮৮ সালের বন্যায় এবং ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত ত্রাণকাজে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দিন–রাত বিপুল পরিশ্রম করেছে । এমনি সংগঠিত উদ্যোগ প্রয়োজন পরিবেশগত সমস্যা এবং তার সমাধানের পদ্ধতি সম্বন্ধে দেশময় সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য ।

আগামী দিনের কর্তব্য

বাংলাদেশের মতো দেশে প্রাথমিক স্কুলের বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পায় মাত্র মোটামুটি ৭০ শতাংশ । আবার তাদেরও এক ছোট অংশ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে । মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়গামীর সংখ্যা সে তুলনায় অনেক কম —মাত্র ২৫ শতাংশের মতো । এই পরিস্থিতিতে জনগণের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এক বিশেষ ধরনের গুরুত্ব লাভ করে । বিশেষ করে দেশের বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর মানুষের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, আলোচনাচক্র, পথসভা এসবের মাধ্যমে এধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

অবশ্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশ–সংক্রান্ত শিক্ষার গুরুত্ব খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই । এজন্য শিক্ষা–সহায়ক নানা ধরনের উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । এছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল ধরনের শিক্ষক–প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে পরিবেশ–সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন । মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।

মানুষ তার অস্তিত্বকালের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াবার ক্ষেত্রে বিপুল সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছে । আজকের দিনে পরিবেশগত যে সব জটিল সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে মানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভা তার কাছে হার মানবে এমন মনে করবার কোন কারণ নেই ।

বিপন্ন পরিবেশ ও শিক্ষা–ব্যবস্থা

সারা পৃথিবীর মানুষ আজ এক বিরাট পরিবেশগত সমস্যার মুখোমুখি । মানুষের সভ্যতার অগ্রযাত্রায় এত বড় সমস্যা মানুষের সামনে বুঝি আর কখনো দেখা দেয় নি । এ সমস্যার ফলে শুধু যে কোন কোন দেশে বন্যা, খরা প্রভৃতি আপাতদৃষ্ট কিছু আবহাওয়াগত বা পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে তা নয়, এর ফলে আগামী দিনে মানুষ এবং সমগ্র জীবজগতের অস্তিত্ব নিয়েই সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

এক হিসেবে দেখতে গেলে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির ফলেই এই পরিবেশগত সমস্যার উদ্ভব। এককালে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ছিল কম; আর সে মানুষ ছিল প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক । প্রকৃতির নানা বৈরী শক্তির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে তাকে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হত । এই বৈরী শক্তির মধ্যে ছিল শীততাপ, ঝড়–ঝঞ্ঝা, বন্য পশুর আক্রমণ, রোগ–মারীর বিপদ, দূর–দূরান্তে যাতায়াত ও যোগাযোগের বাধা, উপযুক্ত ও যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের সমস্যা । এসব সমস্যা মানুষ তার বিপুল মেধা আর কৌশলে ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করে ওঠে ।

বলা চলে মানুষ তার সভ্যতার অগ্রযাত্রায় অন্য সব প্রাণীর ওপর আধিপত্য বিস্তারে অতিমাত্রায় সফল হয়েছে । তার ফলে একদিন যেখানে চারপাশের প্রকৃতির ভারসাম্যে মানুষের প্রভাব ছিল অতি সামান্য — সেখানে আজ মানুষের সংখ্যা এবং প্রকৃতির নানা প্রক্রিয়ায় তার প্রভাব বাড়তে বাড়তে এই ভারসাম্য বিপর্যস্ত হতে আরম্ভ করেছে । জনসংখ্যা বাড়ছে বিপুল হারে; সারা পৃথিবী জুড়ে বন–জঙ্গল ধ্বংস হচ্ছে; বাড়ছে মরুভূমির এলাকা; আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে; চাষবাসে সঙ্কট দেখা দিচ্ছে; অসংখ্য বিষাক্ত রাসায়নিক বস্তুর উদ্ভব ঘটায় পরিবেশ দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে; বন নিধন ও পরিবেশ দূষণের কারণে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠছে; প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচার ব্যবহারের ফলে বহু ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের সঞ্চয় আজ নিঃশেষ হবার পথে ।

পরিবেশ সমস্যা ও তার সমাধান

কোন সন্দেহ নেই যে, পরিবেশ সমস্যার জটিলতা ক্রমেই বাড়ছে । শুধু বিশ শতকের মধ্যেই পৃথিবীর জনসংখ্যা তিনগুণের ওপর বেড়েছে । এই শতাব্দীর শুরুতে যে জনসংখ্যা ছিল ১৬৫ কোটি, তা আজ পাঁচশ কোটি ছাড়িয়ে ছ'শ কোটির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে । এই শতাব্দীর মধ্যে খনিজ ধাতু ও জ্বালানির ব্যবহার বেড়েছে পনের থেকে বিশগুণ । জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে এসেছে শিল্পায়নের বিপুল বিকাশ, অন্যদিকে বন–জঙ্গল ও চাষের জমির ওপর চাপ । বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ এই শতাব্দীর মধ্যে দেশের এক–তৃতীয়াংশ এলাকা থেকে কমতে কমতে এক–দশমাংশের নিচে নেমে গিয়েছে । নিবিড় চাষের সঙ্গে সঙ্গে খেতে নির্বিচারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ বাড়ছে । শিল্প ও কৃষির রাসায়নিক অপবস্তু দূষিত করে তুলছে জলাশয়, চাষের জমি ও চারপাশের বায়ুমন্ডলকে ।

এসব ক্ষতিকর প্রভাব যে সব দেশকে সমানভাবে প্রভাবান্বিত করছে তা নয় । কোন কোন শিল্পোন্নত দেশে শিল্পকারখানার ধোঁয়ায় বায়ুমন্ডল দূষণের ফলে অম্লবৃষ্টি ও তার জন্য বনাঞ্চল ও কৃষিখেতের ক্ষতি হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান সমস্যা; কোথাও প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছে বিপুল আকারে বনাঞ্চল ও জীবজন্তু নিধনের ফলে অসংখ্য জীবপ্রজাতির বিলুপ্তি; কোন দেশে মরুবিস্তারের কারণে গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে পানীয় জলের ও কৃষি উৎপাদনের; আবার বাংলাদেশের মতো কোন কোন দেশে সমস্যা দেখা দিয়েছে পাহাড়ের ঢালে বনাঞ্চল কমে আসার কারণে ভূমিক্ষয় ও নদীর পলি প্রবাহের বৃদ্ধি এবং পর্যায়ক্রমিক ব্যাপক বন্যা ।

সাম্প্রতিককালে আরো দু'টি সমস্যা নিয়ে সারা পৃথিবীতে ব্যাপক আলোড়ন দেখা দিয়েছে । তার একটি হল বায়ুমন্ডলে কারবন ডাই–অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে ওঠার ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার অব্যাহত বৃদ্ধি; একে বলা হচ্ছে 'গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া' । অন্যটি হল সারা পৃথিবী জুড়ে বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়ার ফলে ক্রমাগত অসংখ্য জীবপ্রজাতির বিলুপ্তি ।

আমাদের চারপাশের বায়ুমন্ডল প্রধানত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন হলেও তাতে অতি সামান্য মাত্রায় আছে কারবন ডাই–অক্সাইড গ্যাস । এই গ্যাসটি বিপাক ক্রিয়ার ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী নিঃশ্বাসের সঙ্গে ত্যাগ করে; আবার এই গ্যাস সালোক–সংশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদের খাদ্যবস্তু নির্মাণের জন্য জরুরি প্রয়োজন । জীবজগতের প্রয়োজন সিদ্ধ করা ছাড়াও কারবন ডাই–অক্সাইড পৃথিবীতে তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এই গ্যাসের একটি গুণ হল এটি বায়ুমন্ডলের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলোকরশ্মিকে সহজেই পৃথিবীর ওপর পড়তে দেয়, কিন্তু আলোকশক্তির খানিকটা অংশ যখন পৃথিবী তাপরশ্মির আকারে বিকিরণ করে তখন তাকে শুষে নিয়ে আটকে রাখে । এই তাপরশ্মি মহাকাশে হারিয়ে যেতে পারে না বলেই পৃথিবীর উষ্ণতা রক্ষা হয়; পৃথিবী মানুষ বাসের যোগ্য থাকে । কিন্তু আজ ক্রমে ক্রমে বায়ুমন্ডলে কারবন ডাই–অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ার ফলে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বেড়ে উঠছে ।

হিসেবে দেখা যাচ্ছে শিল্প সভ্যতার শুরুর দিকে অর্থাৎ আজ থেকে মোটামুটি দু'শ বছর আগে বায়ুমন্ডলে কারবন ডাই–অক্সাইডের পরিমাণ ছিল প্রতি লাখে ২৮ ভাগ; আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে লাখে ৩৫ ভাগ; আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি এই হার হয়ে উঠতে পারে লাখে ৫০ ভাগ বা তারও বেশি । এই বৃদ্ধির ফলে ইতোমধ্যে গত একশ বছরে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বেড়েছে ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস । একুশ শতকের মাঝামাঝি বেড়ে

উঠতে পারে তিন–চার ডিগ্রি সেলসিয়াস । এর ফলে সারা পৃথিবীর জলবায়ু এবং চাষবাসের ওপর বেশ বড় ধরনের প্রভাব পড়বে । তাছাড়া সমুদ্রের জলরাশি প্রসারিত হয়ে ডুবিয়ে দেবে বাংলাদেশের মতো অনেক নিচু দেশের বিশাল এলাকা । এর ফলে যে বিপুল ঝড়–ঝঞ্ঝা, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, উদ্বাস্তু প্রভৃতি সমস্যার উদ্ভব ঘটবে তার কথা আজ কল্পনা করাও শক্ত ।

মানুষের সভ্যতার সামনে এমনি বড় ধরনের সংকট ঘনিয়ে আসতে পারে জীবজগতের বৈচিত্র্য বিপন্ন হবার ফলে । বিশ শতকে শুধু যে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটেছে তাই নয়, নগরায়ণ প্রসারিত হয়েছে বিপুল গতিতে । এই শতকের শুরুতে যেখানে পৃথিবীতে নগরবাসী ছিল মাত্র দশ শতাংশ, সেখানে শতাব্দীর শেষে দাঁড়াবে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ । নগরায়ণের এই রুদ্ধশ্বাস গতি একদিকে রিক্ত করে তুলছে গ্রামাঞ্চল আর বনাঞ্চলকে আর সেই সঙ্গে বিপন্ন করছে জীবপ্রজাতির বৈচিত্র্য ।

এ পৃথিবীর আবহাওয়া, বনসম্পদ, কৃষি উৎপাদন এমন কি মানুষের সামগ্রিক জীবনমান অনেকখানি নির্ভর করে পৃথিবীর বস্তু–পরিবেশ ও জীব–পরিবেশের সূক্ষ্ম পরস্পর–নির্ভর ভারসাম্যের ওপর । জীবজগতের অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি তাদের নিজ নিজ জীবনপ্রবাহে একে অন্যের পরিপূরক । কাজেই এর মধ্যে কিছু প্রজাতি যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে তার বিরূপ প্রভাব পড়ে অন্যান্য প্রজাতির অস্তিত্বের ওপর; ক্রমে ক্রমে একদিন মানুষের অস্তিত্বের ওপর হুমকি আসা মোটেই বিচিত্র নয় ।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন, সারা পৃথিবীতে উদ্ভিদ, প্রাণী ও অন্যান্য ধরনের জীব–প্রজাতির সংখ্যা আজ প্রায় এক কোটি । শিল্পসভ্যতার দাপটে গত দু'শ বছর ধরে অব্যাহত গতিতে প্রজাতির সংখ্যা কমছে । খুব সম্ভব এর মধ্যে দু'শতাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং এক–শতাংশের ওপর পাখি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে । এভাবে চললে একুশ শতকের মাঝামাঝি পৌঁছবার আগেই নিশ্চিহ্ন হবে প্রায় ২৫ শতাংশ প্রজাতি । যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি আজ বিলুপ্ত হচ্ছে তার অনেকগুলোরই রয়েছে খাদ্য, ওষুধ বা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে নানা অজানা সম্ভাবনা; তাছাড়া এদের বিলুপ্তি অন্য অসংখ্য প্রজাতির অস্তিত্বও সংকটাপন্ন করে তুলছে । কাজেই নানা প্রজাতির বিলুপ্তি শুধু আমাদের কালের বা আমাদের প্রজন্মের জন্যই সমস্যা সৃষ্টি করছে না, আগামী দিনের সকল প্রজন্মের জন্যও তা বিরাট ক্ষতির বোঝা সৃষ্টি করছে ।

সারা পৃথিবীতে পরিবেশ সংক্রান্ত যে বিপুল সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান আজ মানুষের সভ্যতার সামনে এক বড় রকম দায়িত্ব হিসেবে দেখা দিয়েছে । বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে এ বিষয়ে ক'টি সত্য আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছেঃ

১. পরিবেশের সমগ্র বস্তু–উপাদান আর জীব–উপাদানের অস্তিত্ব ও সুস্বাস্থ্য নির্ভর করে তাদের পরস্পর–নির্ভর সূক্ষ্ম ভারসাম্যের ওপর ।

২. সকল রকম উন্নয়ন কার্যক্রমে এই ভারসাম্যের সুরক্ষা ও পরিবেশের প্রবহমানতার বিবেচনাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে ।

৩. পরিবেশের অনেক সমস্যার মূলে রয়েছে মানুষের অজ্ঞতা ও বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণা ও সুপ্রয়োগই এসব সমস্যার সমাধান দিতে পারে ।

৪. পরিবেশের নানা জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য সমগ্র জনসমাজের পরিবেশ–সচেতনতা, পরিবেশ–শিক্ষা ও সক্রিয় সামাজিক কর্মোদ্যোগ প্রয়োজন ।

পরিবেশ চেতনা ও শিক্ষা

পরিবেশ চেতনা ও শিক্ষার সমস্যা যেমন সারা পৃথিবীর জন্য আজ জরুরি— তা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য মনে হয় আরো বেশি করে জরুরি । বাংলাদেশের মতো এমন ছোট একটি দেশে মাত্র ১৪৪,০০০ বর্গকিলোমিটার জায়গায় প্রায় এগার কোটি লোক ঠাসাঠাসি হয়ে আছে । প্রতি বর্গকিলোমিটার জমিতে শুধু যে গড়ে প্রায় ৮০০ জন মানুষ তা নয়, জনসংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছে ২.১ ভাগ হারে । অনাহার, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা যেদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী সে দেশে বনাঞ্চল, চাষের জমি, জলাশয়, জীবকুল আর নগর–পরিবেশের অবনতি রোধ করা দুঃসাধ্য ।

এদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে । কিন্তু তবু এযাবৎ জন্মশাসন গ্রহণকারী সক্ষম দম্পতির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৪ শতাংশের মতো; অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অসচেতনতাই এর প্রধান কারণ। জনসংখ্যা এদেশের প্রধান সম্পদ; কিন্তু এই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ এখনও অত্যন্ত নিম্নমানের । বয়স্ক নিরক্ষরতা প্রায় ৭০ শতাংশ; প্রাথমিক স্তরের বয়সী শিশুদের মাত্র ৭০ শতাংশের মতো বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পায় । আবার যারা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় তাদের মধ্যে প্রায় ৬৫ শতাংশ ঝরে পড়ে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠতে উঠতে। মাধ্যমিক স্তরের বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় মাত্র ২৫ শতাংশ ।

বর্তমানকালের সভ্যতার একটি অতি বিসদৃশ পরিস্থিতি এই যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণকর দিকগুলো ভোগ করছে প্রধানত পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো — অথচ বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো পাচ্ছে প্রধানত বাতিল হয়ে যাওয়া পুরনো প্রযুক্তি আর পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিকগুলোর সিংহভাগ । যেদেশের মানুষ প্রধানত নিরক্ষর তাদের না আছে যথাযথ যুক্তিজ্ঞান, না আছে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার যথাযথ জ্ঞান ও কুশলতা । 'পরিবেশের ভারসাম্য' বা 'টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া' স্বভাবতই তাদের কাছে সুবোধ্য নয় । এসব দেশে পরিবেশের সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতার অভাবে অনেক সময় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডও পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় । বাংলাদেশে কৃষিখেতে জলসেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন অনেক অঞ্চলে বিপদ সৃষ্টি করেছে । দেশের দক্ষিণাঞ্চলে চিংড়ি চাষের জন্য নির্বিচারে ঘের দিয়ে সমুদ্রের লোনা পানির ঢোকাবার ফলে শুধু চাষের জমি নষ্ট হচ্ছে না, দীর্ঘকালের জন্য পরিবেশের ভারসাম্যও বিনষ্ট হচ্ছে ।

পরিবেশ রক্ষা এবং টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য সমগ্র জনগণের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও কর্মোদ্যোগ একান্ত জরুরি বলেই দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় এ বিষয়টির ওপর আজ বিশেষ গুরুত্ব দেয়া অবশ্য প্রয়োজন হয়ে উঠেছে । একদিকে যেমন চাই পরিবেশের নানা জটিল সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য দক্ষ বিশেষজ্ঞ জনশক্তি, তেমনি প্রয়োজন জনসমাজের মধ্যে পরিবেশের সমস্যা ও সেসবের সমাধানের পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা ।

আমাদের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত মূল সমস্যা মোটামুটি সাত ধরনেরঃ (১) পরিবেশের সংরক্ষণ; (২) খাদ্য ও পুষ্টি; (৩) পরিবার পরিকল্পনা; (৪) স্বাস্থ্য–ঝুঁকি ও সংক্রামক ব্যাধি; (৫) পরিবেশ দূষণ; (৬) শক্তি ও সম্পদ সংরক্ষণ; এবং (৭) বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য ।

শিশু ও তরুণ সমাজ আমাদের সমাজের সবচাইতে কৌতূহলী, সক্রিয় এবং সুগ্রাহী অংশ; কাজেই পরিবেশবিষয়ক সচেতনতা তাদের মধ্যেই সবার আগে সৃষ্টি করা প্রয়োজন । এই শিশু ও তরুণ সমাজ তৈরি হচ্ছে আগামী দিনের জন্য । সে আগামী দিন কেমন হবে, কেমন করে তাদের তৈরি হতে হবে সে দিনের জন্য —আর সেই আগামী দিনকে কিভাবে মানুষের জন্য সবচেয়ে মনোরম আর কল্যাণকর করে তোলা যায় তা তরুণ সমাজেরই সবার আগে জানা প্রয়োজন ।

এই তরুণ সমাজের জন্য এমন শিক্ষাক্রম তৈরি করতে হবে যা তাদের নিজেদের এবং তাদের পরিমণ্ডলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাকে স্পর্শ করে; যা কর্মমুখী শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা দেয়; একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে; এবং শিক্ষার্থীর মনে স্থানীয় সমস্যা ও বিশ্বসমস্যা মিলিয়ে একটি সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টি ও মূল্যবোধ গড়ে তোলে । এই শিক্ষায় থাকতে হবেঃ

১. পরিবেশ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক, আর্থনীতিক, সামাজিকও সাংস্কৃতিক গুরুত্বসম্পন্ন নানা প্রয়োজনীয় তথ্য; সেই সঙ্গে এসব তথ্যের আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধির ব্যবস্থা;
২. নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক দক্ষতা বিকাশের সুযোগ — যেমন পর্যবেক্ষণ ও তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা সমাধান ও ভাবের আদান–প্রদানের দক্ষতা; এবং
৩. জীবনের প্রতি ভালবাসা; জীবনের গুণগত মান, সৌন্দর্যবোধ, নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলোর বিষয়ে সচেতনতা।

এ বিষয়গুলো শুধু পরিবেশ শিক্ষার কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করাই যথেষ্ট নয়; এসব যাতে যথাযথভাবে শিক্ষা দেয়া হয় সেজন্য শিক্ষকদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত পাঠ্যবই, সহায়ক বইপত্র এবং অন্যান্য শিক্ষা–উপকরণের সরবরাহ, যথাযথ মূল্যায়ন ব্যবস্থা —এসবেরও আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে ।

শিক্ষাক্রমে পরিবেশ

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপরই এই নব্য স্বাধীন দেশের জন্য একটি উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ১৯৭২ সালে সরকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ মুহাম্মদ কুদরাত–এ–খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন । এই কমিশন ১৯৭৪ সালে যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে এবং তারপর যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি কমিটি গঠিত হয় তার রিপোর্টে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশবিষয়ক বিবেচনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। ১৯৭৮ সাল থেকে এই নতুন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন শুরু হয় । এতে প্রাথমিক স্তরে (১–৫ শ্রেণী) বিজ্ঞান ও সমাজপাঠের জায়গায় 'পরিবেশ পরিচিতি' বিষয় প্রবর্তন করা হয়; এছাড়া মাধ্যমিক স্তরের (৬–১০) 'সাধারণ বিজ্ঞান' পাঠ্যসূচিতেও 'প্রাণী ও উদ্ভিদের পরস্পর–নির্ভরতা', 'জনসংখ্যা ও পরিবেশ' প্রভৃতি নানা পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ।

উচ্চশিক্ষার স্তরে এদেশের সব ক'টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এসসি. (অনার্স) ও এম.এসসি. পর্যায়ে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানের শিক্ষাক্রমে 'বাস্তুবিদ্যা' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান এম.এসসি. পর্বে সব গ্রুপের জন্য আবশ্যকীয় 'উচ্চতর জীববিদ্যা' পত্রে রয়েছে 'মানব–বাস্তুবিদ্যা', 'বিকিরণ–জীববিদ্যা', 'পরিবেশ দূষণ' ও 'আঞ্চলিক জীববিদ্যা' বিষয়ক আলোচনা । রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিজ্ঞানের এম.এসসি. শেষ পর্বে 'বাস্তুবিজ্ঞান' শাখায় এবিষয়ে দু'টি বিশেষ কোর্স নেবার সুযোগ রয়েছে ।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে পরিবেশ–প্রকৌশল বিষয়ে তিনটি বিশেষ কোর্স রয়েছে.। এছাড়া স্নাতকোত্তর স্তরেও পরিবেশ–প্রকৌশল ও পরিবেশ–ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কোর্স নেবার ব্যবস্থা রয়েছে । বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিষয়ক পরিবেশ সংক্রান্ত কোর্স রয়েছে । দেশের ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে এবং আরো নানা সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিবেশবিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে ।

এসব আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আয়োজন ছাড়াও সমগ্র জনসমাজের মধ্যে পরিবেশ চেতনা গড়ে তোলা এবং পরিবেশবিষয়ক জ্ঞান বিস্তারের জন্য রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে বন্যা ও ঝড়–ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, জলদূষণ, বনাঞ্চল বিনাশ, শিল্পজাত বর্জ্য, বন্যপ্রাণী নিধন প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয় । অবশ্য এসব উদ্যোগ যে যথেষ্ট তা বলা শক্ত । এই মূলত নিরক্ষর মানুষের দেশে পরিবেশবিষয়ক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার আয়োজন আরো অনেক ব্যাপক আকারে হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কয়েকটি পেশাজীবী ও সমাজসেবামূলক বেসরকারী সংস্থা তাঁদের সাধ্যমতো অবদান রাখছেন ।

পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা আশাপ্রদ হলেও মোটেই সন্তোষজনক বিবেচনা করা যায় না । আশাপ্রদ এই অর্থে যে, বাংলাদেশ শিক্ষা

কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪) থেকে শুরু করে এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে গত প্রায় দু'দশক ধরে পরিবেশ বিষয়ক একটি সুস্পষ্ট সচেতনতার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । তবে দুর্ভাগ্যক্রমে এই সচেতনতা এখনও ব্যাপক, সংগঠিত ও প্রয়োজনীয় উচ্চমানের শিক্ষা কার্যক্রমে পরিণত হতে পারে নি । সমস্যাটি মূলত সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতার সঙ্গে সম্পর্কিত । বিদ্যালয় পর্যায়ে সত্তরের দশকের শেষে যে শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হয়েছিল তার নবায়ন ও আধুনিকীকরণ জরুরি প্রয়োজন হয়ে উঠেছে । সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের মান উন্নয়নের প্রচুর সুযোগ রয়েছে ।

উচ্চশিক্ষার স্তরে উপকরণের অভাব যেমন প্রকট, গবেষণার সুযোগও তেমনি অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ । বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক যে অর্থ বরাদ্দ করেন তার হাজার ভাগের একভাগও গবেষণার জন্য ব্যয়িত হয় কিনা সন্দেহ । পরিবেশের সমস্যা আজ যেমন জটিল হয়ে উঠেছে তাতে এই বহুমুখী সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন । সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশবিষয়ক সমন্বিত চর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

কয়েকটি মূল সমস্যা ও শিক্ষা কর্মসূচি

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি মূল সমস্যার বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং এই বিষয়গুলোকে শিক্ষা কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দিতে হবেঃ

১. *জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সীমিত করা ঃ* বাংলাদেশের পরিবেশগত অনেক সমস্যারই মূল নিহিত রয়েছে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির মধ্যে । এদেশে জনবসতির নিবিড়তা পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের অথচ জন্মশাসন গ্রহণের হার অত্যন্ত কম । জনসংখ্যার বেপরোয়া বৃদ্ধির বিপদ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা তাই জরুরি প্রয়োজন ।

২. *বনায়ন কর্মসূচি বিস্তার ঃ* বাংলাদেশে বনাঞ্চলের বিস্তার দ্রুত কমে যাচ্ছে । শুধু এই শতাব্দীতেই বনাঞ্চলের পরিমাণ মোট ভূভাগের ৩০ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে । ইতোমধ্যে কিছু কিছু সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । বন নিধনের জন্য শাস্তির পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে । এসকল উদ্যোগ আরো বহুগুণে শক্তিশালী করা প্রয়োজন ।

৩. *শক্তি ও জ্বালানি ব্যবহারে মিতব্যয়িতা ঃ* আমাদের খনিজ জ্বালানির পরিমাণ সীমাবদ্ধ; সেজন্য জ্বালানি ব্যবহারে মিতব্যয়িতার ওপর জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন । জ্বালানিসাশ্রয়ী উন্নত চুলা ও কুপি ইতোমধ্যে উদ্ভাবিত হয়েছে, কিন্তু এগুলো এখনো ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে না । জ্বালানি গ্যাসের অপচয় হ্রাস, সবচেয়ে দক্ষ ব্যবহার এবং সৌরশক্তি প্রভৃতি নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে ।

৪. ***টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ*** উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের সময় তাতে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, বাস্তুগত ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশের গুণগত মান উন্নয়নের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনায় নিতে হবে । সকল উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত অভিঘাতের বিষয় আগে থেকেই বিবেচনা করতে হবে এবং এবিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে ।

৫. *বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশিক্ষার ব্যাপক বিস্তারঃ* পরিবেশের বহুমুখী সমস্যার সমাধানের জন্য প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জনসমাজের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব দান একান্ত জরুরি । দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে মাত্র ৭০ শতাংশ ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মাত্র ২৫ শতাংশ ছেলেমেয়ের অংশ গ্রহণ মোটেই সন্তোষজনক বিবেচনা করা যায় না । এতে পরিবেশের সমস্যা মোকাবিলা করার মতো বিজ্ঞান–প্রযুক্তিবিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা বিস্তারও দুঃসাধ্য । মাধ্যমিক পর্যায়ে বর্তমানে মাত্র অর্ধেকের মতো শিক্ষার্থী বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ পায়; প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই সুযোগ অবিলম্বে বিস্তৃত করা প্রয়োজন ।

৬. *ব্যাপক জনসমাজের মধ্যে পরিবেশ চেতনা বিস্তারঃ* পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হবার ফলে সারা পৃথিবীতে যে এক বিরাট বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে এবিষয়ে সমগ্র জনসমাজকেই সচেতন করে তুলতে হবে এবং এই বিপর্যয় ঠেকাবার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেও তাদের অবহিত ও শিক্ষিত করতে হবে । বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও নানামুখী কর্মসূচি গড়ে তোলার ওপর জোর দিতে হবে ।

এদেশে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । সেগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন ও আধুনিকায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি; এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার দিকটিও বিবেচনায় নিতে হবে । এ সম্পর্কে নিচের বিষয়গুলোর ওপর নজর দেয়া প্রয়োজনঃ

১. *উন্নত শিক্ষা প্রশাসন ও পরিদর্শন ব্যবস্থাঃ* বর্তমানে দেশে যে শিক্ষা প্রশাসন ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা আছে তা মোটেই যথেষ্ট নয় । ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শনের দুর্বলতার কারণে শিক্ষা কর্মসূচি অনেক ক্ষেত্রেই তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে না ।

২. *শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির নবায়নঃ* দেশে সকল স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ক্রমাগত নবায়ন করা প্রয়োজন । এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর যেমন আধুনিকীকরণ করতে হবে তেমনি তার বিন্যাসের ক্ষেত্রে দৃষ্টি দিতে হবে উল্লম্ব সমন্বয় ও অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে আনুভূমিক সাযুজ্যের দিকে । দেশের নানা অঞ্চলের পরিবেশগত সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমস্যার বিষয় সেই সব

অঞ্চলের শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন । জনগণের লৌকিক ঐতিহ্যগত যেসব পরিবেশগত জ্ঞান স্থানীয় প্রবাদ প্রভৃতিতে বিধৃত হয়ে আছে সেগুলোকেও যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে ।

৩. *শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ* ঃ পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে । এই পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি দেশের সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ।

৪. *পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণ* ঃ পরিবেশসংক্রান্ত নানা ক্ষেত্রে — যেমন জলসম্পদ, কৃষি, বন, জ্বালানি, খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি — উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন সংরক্ষণকর্মী গড়ে তুলতে হবে । এজন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও শিক্ষা কর্মসূচি জোরদার করা প্রয়োজন ।

৫. *গবেষণায় অর্থ সংস্থান* ঃ পরিবেশবিষয়ক গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য যথোপযুক্ত উপকরণ ও অর্থবরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে ।

৬. *প্রকাশনা ও পত্র-পত্রিকা* ঃ পরিবেশ বিষয়ে প্রচুর পরিমাণ বই, পত্র-পত্রিকা ও শিক্ষাসহায়ক গ্রন্থাদি প্রকাশের আয়োজন করতে হবে । এজন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারী প্রকাশকগণ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন ।

কিছু কর্মসূচি

পরিবেশের বিষয়টি আজ সারা পৃথিবীব্যাপী এবং বাংলাদেশেও এমন একান্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, পরিবেশ শিক্ষা প্রসঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে কিছু কর্মসূচি নেবার কথা ভাবা যেতে পারে । এক্ষেত্রে প্রধান কর্তব্য হবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্রমাগত তথ্য ও জ্ঞান আহরণ, সমগ্র জনসমাজের সচেতনতার মান বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পরিবেশবিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা সঞ্চারের উন্নত আয়োজন । সচেতনতা সঞ্চারের উপযুক্ত পদ্ধতি বিষয়ে গবেষণা ও উপযুক্ত উপকরণ উন্নয়নের ক্ষেত্রেও উদ্যোগ প্রয়োজন। এসকল কর্মসূচিতে সরকারী বেসরকারী সকল সংশ্লিষ্ট মহলের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে । সবশেষে প্রয়োজন বিভিন্ন কর্মসূচির তদারকি ও মূল্যায়ন । আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ে পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ে নিম্নোক্ত ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ভাবা যেতে পারে ঃ

ক। *জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলন* ঃ পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের আন্দোলনে দেশের সকল সচেতন জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।

খ। *জাতীয় পরিবেশ শিক্ষা কমিটি গঠন* ঃ এ ধরনের একটি কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে দেশের সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশ শিক্ষার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে । তার ভিত্তিতে এ বিষয়ে শিক্ষাকে সময়োপযোগী ও আরো কার্যকর করে তোলার উদ্যোগ নেয়া যায় ।

গ। *পরিবেশবিষয়ক পাঠ্যবই ও শিক্ষাসহায়ক উপকরণ তৈরি* ঃ জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য উন্নতমানের পাঠ্যবই তৈরি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওপর ন্যস্ত । অন্যান্য পর্যায়ের বই প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন ।

ঘ। *বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশবিষয়ক ইনস্টিটিউট বা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা* ঃ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশসংক্রান্ত বিষয়গুলি জ্ঞানের নানা বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেজন্য 'ইন্টারডিসিপ্লিনারি' বা আন্তঃবিষয়গত পরিবেশচর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন বায়ুগত পরিবর্তন, পরিবেশগত ঝুঁকি, শক্তি সংরক্ষণের নানা পদ্ধতি, প্রতিকারের পন্থা এসব বিষয়ে গবেষণা পরিচালিত হতে পারে।

ঙ। *কর্মকালীন প্রশিক্ষণ* ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কর্মীদের এবং পরিবেশবিষয়ক নানা পর্যায়ের শিক্ষক ও শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের কর্মকালীন ব্যাপক প্রশিক্ষণের আয়োজন থাকা প্রয়োজন ।

চ। *পরিবেশসংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা* ঃ দেশে পরিবেশবিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য উপযুক্ত জনসম্পদ ও অর্থসম্পদ যোগান দেবার ব্যবস্থা করতে হবে । বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে পারেন । অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন ।

ছ। *পরিবেশগত অভিঘাত সম্পর্কে প্রশিক্ষণ* ঃ দেশে কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, জ্বালানি, জলসম্পদ প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে যেসব উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গৃহীত হয় তার অনেকগুলিরই অনভিপ্রেত পরিবেশগত অভিঘাত দেখা যায় । এবিষয়ে পূর্বাহ্নে সতর্কতা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ।

জ। *জনসংযোগমূলক শিক্ষা* ঃ সাম্প্রতিককালে ইলেকট্রনিক জনসংযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবেশ বিষয়ে ব্যাপক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা যেতে পারে । এবিষয়ে জনসংযোগ কর্মী ও সাংবাদিকদের জন্য কিছু কিছু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে । ভ্রাম্যমান নাটক, সঙ্গীতদল প্রভৃতির মাধ্যমেও পরিবেশবিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির আয়োজন করা যেতে পারে ।

ঝ। *যুব ও সামাজিক সংগঠনের কার্যক্রম* ঃ পরিবেশবিষয়ক জ্ঞান ও সচেতনতা বিস্তারের ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন যুব ও সামাজিক সংগঠনসমূহও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ।

পরিবেশ সঙ্কট ও বাংলাদেশ

পরিবেশের সমস্যা সারা পৃথিবীর জন্য যেমন গুরুতর, তার চেয়েও বেশি মারাত্মক বাংলাদেশের জন্য । এই সঙ্কট আজ যতটা গভীর, আগামী দিনে তার চেয়ে আরো গভীর হয়ে উঠতে পারে — বিশেষ করে যদি আমরা এখনই যথেষ্ট সচেতন হয়ে না উঠি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করি । এদেশের সীমিত বস্তুসম্পদ ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আগামী দিনে এ সঙ্কটকে ক্রমেই ঘনীভূত করে তুলে এক চরম জাতীয় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে ।

এই সঙ্কটের সমাধানের জন্য আজই শিক্ষামূলক ও অন্যান্য সামাজিক-আর্থনীতিক প্রতিকারের পদক্ষেপ জরুরি ভিত্তিতে নেয়া প্রয়োজন । তা নইলে আগামী প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব পালনে আমরা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেব ।

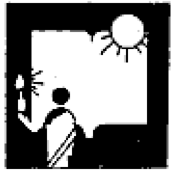

পরিবেশ, প্রযুক্তি ও নারী

মানুষ ও অন্য সব জীবের জীবনমান অনেকটাই নির্ভর করে তার চারপাশের পরিবেশের ওপর । সৌরজগতে গ্রহদের মধ্যে যে কেবল পৃথিবীর বুকেই প্রাণের উদ্ভব ঘটছে, আর কোন গ্রহের ওপর হয় নি, এতেই স্পষ্ট করে বোঝা যায় প্রাণের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রবহমানতার জন্য পরিবেশের বিশেষ কিছু গুণাবলি প্রয়োজন ।

আমাদের পরিবেশকে দেখা যেতে পারে নানাভাবে । একে তো পরিবেশে রয়েছে নানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান; প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে আবার জড় ও জৈব নানা বস্তু । এসব নানা ধরনের বস্তুর কিছু আছে আগে থেকেই, কিছু আবার মানুষের সৃষ্টি । বলা বাহুল্য পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তার সভ্যতার যেমন প্রসার ঘটেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্ট উপাদানের পরিমাণ ও প্রভাব বেড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।

পৃথিবীর একেবারে আদিতে এখানকার পরিবেশে কেবল জড় উপাদানেরই অস্তিত্ব ছিল। তখন পৃথিবীতে না ছিল কোন জীব, না কোন সামাজিক উপাদান । ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে জৈব উপাদানের উদ্ভব ঘটেছে; ক্রমবিকাশের ধারায় এসেছে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। অন্য সব প্রাণীর চেয়ে মানুষ পরিবেশের ওপর বেশি করে প্রভাব ফেলতে আরম্ভ করেছে ।

পরিবেশের একটি প্রধান চরিত্র এই যে, এর নানা উপাদানের মধ্যে এক ধরনের সূক্ষ্ম, জটিল এবং পরস্পর-নির্ভর ভারসাম্য রয়েছে । আমাদের চারপাশে যে প্রধান চারটি ভৌত উপাদান — বাতাস, পানি, মাটি ও সৌরকিরণ — তাদের মধ্যে দীর্ঘকালের মিথস্ক্রিয়ায় পরিবেশের নানা উপাদানের এই পারস্পরিক ভারসাম্য গড়ে উঠেছে । পৃথিবীর আদি পরিবেশ এবং আজকের পরিবেশ স্বভাবতই এক নয় । পৃথিবী ক্রমে ক্রমে বদলে গিয়েছে; আর এসব পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে পরিবেশের এই ভারসাম্যও ধীরে ধীরে বদলেছে ।

পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব ঘটার পর জীবজগৎও পরিবেশের পরিবর্তনে ছাপ ফেলেছে । গাছপালা চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিরন্তর প্রভাবিত করে চলেছে । পৃথিবীর নানা অঞ্চলে তাপমাত্রা ও মাটি-পানির তারতম্য অনুযায়ী নানা ধরনের উদ্ভিদ জন্মেছে; তেমনি জন্মেছে বহু বিচিত্র ধরনের প্রাণী । একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, কোন এলাকার উদ্ভিদ আর প্রাণীর প্রকৃতি অনেকটাই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল ।

প্রকৃতির ওপর সবচেয়ে বেশি ছাপ ফেলেছে মানুষ । প্রাণীদের মধ্যে মানুষই সবচেয়ে বুদ্ধিমান, তাই সে চারপাশের প্রকৃতিকে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগিয়েছে — সবচেয়ে বেশি বদলাতে চেয়েছে । মানুষ প্রকৃতিকে বদলেছে তার নিজেরই প্রয়োজনে; চেয়েছে চারপাশের পরিবেশকে তার নিজের জন্য আরো বেশি উপযোগী, আরো বেশি মনোরম করে তুলতে ।

পরিবেশ ও প্রযুক্তি

চারপাশের পরিবেশকে নিজের প্রয়োজনমতো বদলাবার জন্য মানুষ প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটিয়েছে। নানা কৌশলে পরিবেশের অজস্র উপাদানকে লাগিয়েছে নিজের কাজে । অবশেষে প্রকৃতির নানা নিয়মকানুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানকে মানুষ আয়ত্ত করেছে । তাতে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার তার জন্য আরো সহজ হয়ে উঠেছে ।

বিস্তীর্ণ এলাকাকে সমান করে নিয়ে, চাষ করে মানুষ ফলাতে শুরু করেছে ফসল; উদ্ধার করেছে জলাভূমি; বনজঙ্গল কেটে সৃষ্টি করেছে গ্রাম আর নগর; পাহাড় কেটে বের করেছে পথ; জীবনের নানা প্রয়োজনীয় বস্তু নির্মাণের জন্য বসিয়েছে অসংখ্য কলকারখানা; সৃষ্টি করেছে বিশাল সব জলাধার আর বাঁধ,নানা নতুন ধরনের উদ্ভিদ আর প্রাণী । এসবের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে এসেছে অভূতপূর্ব প্রাচুর্য আর স্বাচ্ছন্দ্য।

আঠার শতকের শেষে বিলেতে শিল্প-বিপ্লব ঘটে । এই শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপে । তারপর সারা পৃথিবীতে । কয়লার জ্বালানি শক্তিকে রূপান্তরিত করা হল বাষ্পের শক্তিতে— সেই শক্তিতে চলতে লাগল কল-কারখানা, রেলগাড়ি । অবিশ্বাস্যরকম দ্রুত কমে যেতে লাগল উৎপাদনের ব্যয় ।

ক্রমে ক্রমে কয়লার শক্তির পর এল তেল আর বিদ্যুতের শক্তি । রসায়নের আশ্চর্য কৌশল আবিষ্কারের ফলে উদ্ভব ঘটল নানা নতুন গুণাগুণযুক্ত বস্তু । নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে প্রকৃতির অজানা রহস্য উদঘাটনও অনেক সহজ হয়ে গেল । যেমন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জানা গেল জীবাণুতত্ত্বের কথা । রসায়নের জ্ঞান এসব জীবাণুকে কাবু করার জন্য নানা ধরনের ওষুধের জন্ম দিতে লাগল । বহু দুরারোগ্য রোগব্যাধির ওপর মানুষের বিজয় সূচিত হল ।

এমনি সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবী মানুষের জন্য আরো বেশি বাসযোগ্য হয়েছে । নতুন নতুন শক্তির উৎস আয়ত্ত করে, উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করে এবং অজস্র নতুন পণ্যদ্রব্য সৃষ্টি করে মানুষ তার জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে । রোগ-ব্যাধিকে অনেকখানি জয় করতে পারার ফলে মানুষের মৃত্যুহার কমেছে, গড়পড়তা আয়ু বেড়েছে ।

এসবের মধ্য দিয়ে প্রাণী হিসেবে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে । তাই মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি শিল্প সভ্যতার বিকাশের পর গত দু'শ বছরে ক্রমেই দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়েছে । সারা উনিশ শতকে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়েছিল মোটামুটি দ্বিগুণ; বিশ শতকে তিনগুণের ওপর বেড়েছে । পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে যখন চারপাশে মানুষের প্রভাব দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা প্রকৃতির সূক্ষ্ম পরস্পর-নির্ভর ভারসাম্যে বিপর্যয় ঘটাতে আরম্ভ করেছে; আর আজ অবশেষে পরিবেশের ওপর মানুষের প্রভাব যতটা কল্যাণকর হচ্ছে তার চেয়ে বেশি অকল্যাণকর হয়ে দাঁড়াবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ।

এ অবস্থায় পৃথিবীর জনসংখ্যার মোটামুটি অর্ধেক যে নারী সমাজ তাঁদের ভূমিকা কি? সারা পৃথিবীর পুরুষ সমাজের সঙ্গে নারী সমাজ কতটা ভূমিকা রাখতে পারে পরিবেশের অবনতি রোধ করে পৃথিবীকে আরো বাসযোগ্য করে তোলার জন্য — এ প্রশ্ন আজ আমাদের সকলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে । নারীরা কতখানি অবদান রাখছেন পরিবেশের এসব পরিবর্তনে, কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছেন এসবে — এগুলোও সেইসঙ্গে বিবেচনায় আসে ।

পরিবেশের নানা সমস্যা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতি ঘটতে শুরু করে আঠারো শতকের শেষে বিলেতে শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে । তখন থেকে পৃথিবীর জনসংখ্যা যেমন দ্রুত বেড়েছে তেমনি পরিবেশের নানা জটিল সমস্যারও উদ্ভব ঘটতে শুরু করেছে । উনিশ শতক বা বিশ শতকের প্রথমভাগেও অনেক সমস্যা তেমন প্রকাশ্য হয়ে ওঠে নি; কিন্তু বিশ শতকের শেষ ভাগে এসব সমস্যা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে । এ সমস্যাগুলো যে শুধু বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে ঘটছে তা নয়, বাংলাদেশের পরিবেশেও আজ এসব সমস্যা প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে । এ ধরনের সমস্যার মধ্যে নিচের ক'টি বিষয়কে প্রধান বলে বিবেচনা করা যেতে পারে ।

১. *জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি* ঃ শিল্প-বিপ্লবের চূড়ান্ত পর্যায়ে উনিশ শতকের প্রথমভাগে সারা পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল মাত্র একশ কোটি । তারপর একশ বছরের মধ্যে ১৯৩০ সালে এই মাত্রা দু'শ কোটি ছাড়িয়ে যায়; এর পরের মাত্র কয়েক দশকে এই অঙ্ক লাফাতে লাফাতে তিনশ, চারশ ও পাঁচশ কোটির সীমা ডিঙিয়ে আজ ছ'শ কোটি ছুঁই ছুঁই করছে । এই বিপুল জনসংখ্যা পৃথিবীর মাটি, পানি আর বায়ুমন্ডলে যে চাপ সৃষ্টি করছে তা পরিবেশের ভারসাম্য বিপর্যস্ত করে তুলছে । বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা ৮০০ ছাড়িয়েছে; জনসংখ্যার বৃদ্ধি যদি এই হারে চলতে থাকে তাহলে একুশ শতকে পরিবেশে যে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তার কথা আজ কল্পনা করাও শক্ত ।

২. *শিল্প দূষণ* ঃ পৃথিবীতে কলকারখানা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে চারপাশে পরিবেশের দূষণ । শুধু এই বিশ শতকেই কয়লা, তেল প্রভৃতি খনিজ জ্বালানির ব্যবহার বেড়েছে পনের গুণের ওপরে। তার ফলে কলকারখানা

বায়ুমন্ডলে উগরে দিচ্ছে বিপুল পরিমাণ কারবন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড এসব বিষাক্ত বস্তু । তাছাড়া শিল্পকারখানা থেকে বেরোচ্ছে প্রচুর তরল রাসায়নিক বর্জ্যদ্রব্য; সেগুলো দূষিত করে তুলছে নদী-নালা-জলাশয়, মৃত্যু ঘটাচ্ছে জলজ উদ্ভিদ আর প্রাণীদের --- স্বাস্থ্যের হানি ঘটাচ্ছে মানুষের । শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বায়ুমন্ডলের দূষণ শুধু মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ফুসফুসকে আক্রান্ত করছে না, সেই সঙ্গে অম্লবৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে নিঃশেষ করছে বন-বনানীকে, হ্রদ-জলাশয়ের জীবকুলকে ।

৩. *বন-বিনাশ ঃ* মানুষ চিরকালই বনের গাছপালা কেটেছে জ্বালানির প্রয়োজনে, আশ্রয়-আসবাবপত্র তৈরির জন্য, আরো নানা কারণে । কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই বন-বিনাশ আজ ব্যাপক রূপ নিয়েছে। এককালে বনের গাছপালা কাটলে তা প্রাকৃতিক নিয়মে পুনরুজ্জীবিত হত; কিন্তু আজ বিনাশের পরিমাণ এমন বেড়ে উঠেছে যে, প্রাকৃতিক নবায়ন আর তার সঙ্গে তাল রেখে উঠতে পারছে না । সারা পৃথিবীতে জনবসতির এলাকা যেমন বাড়ছে, তেমনি বনাঞ্চলের পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে। বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ আজ প্রতি বছর মোটামুটি শতকরা এক ভাগ হারে কমতে কমতে দেশের মোট স্থলভাগের দশ-শতাংশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। তার ফলে ভূমিক্ষয় মারাত্মক রূপ নিয়েছে উত্তরাঞ্চলে ভূমিক্ষয়ের ফলে নদীর খাত বুজে গিয়ে ব্যাপক বন্যার প্রকোপ বাড়ছে; বনাঞ্চলের পরিমাণ কমে আসায় জলবায়ুতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটছে।

৪. *বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঃ* বায়ুমন্ডলে কারবন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠায় পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়ছে । খনিজ জ্বালানি পোড়ানোর ব্যাপকতা এবং বনজঙ্গল নিধনের মিলিত ফল হিসেবে গত দু'শ বছরে বায়ুমন্ডলে কারবন ডাই-অক্সাইডের হার গড়পড়তা লক্ষভাগে ২৮ ভাগ থেকে বেড়ে ৩৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে; আগামী পঞ্চাশ বছরে এই হার প্রতি লক্ষভাগে ৫০ ভাগ ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। কারবন ডাই-অক্সাইড গ্যাসটি সূর্যের ছোট মাপের আলোকরশ্মিকে সহজেই পৃথিবীতে পড়তে দেয়, কিন্তু পৃথিবী থেকে ছিটকে ওঠা বড় মাপের তাপরশ্মিকে অনেকখানি আটকে রাখে । এভাবে গত দু'শ বছরে বায়ুমন্ডলের গড় তাপমাত্রা আধ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বেড়েছে; আগামী পঞ্চাশ বছরে আরো তিন থেকে চার ডিগ্রি বাড়তে পারে । এতে সারা পৃথিবীতে জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে; সমুদ্রের পানি ফুলে উঠে উপকূলের নিচু এলাকাগুলোকে ডুবিয়ে দেবে । বাংলাদেশ এবং এরকম আরো অনেক বদ্বীপ অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য এর ফল হবে ভয়াবহ ।

৫. *উঁচু বায়ুমন্ডলে ওজোন-স্তরে ক্ষয়ঃ* পৃথিবীর উঁচু বায়ুমন্ডলে ওজোন নামে গ্যাসের একটি হালকা স্তর আছে; এটি সূর্যের তেজী অতিবেগুনি রশ্মি অনেকখানি পরিমাণে শুষে নিয়ে মানুষ ও অন্যান্য জীবকুলকে রক্ষা করে। মানুষ আজ নানারকম স্প্রে, হিমায়ক, শীতাতপ যন্ত্র ইত্যাদিতে এমন সব গ্যাসীয় রাসায়নিক বস্তু ব্যবহার করছে যা এই ওজোন স্তরকে ধ্বংস করে দেয় । বিজ্ঞানীরা বলছেন এসব রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহার দ্রুত কমিয়ে না আনলে সারা পৃথিবীর মানুষ ও জীবকুলের জন্য গুরুতর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে ।

৬. *ক্ষতিকর রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহারঃ* আজ মানুষের জীবনে নানা ধরনের রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহার বাড়ছে । ফসলের উৎপাদন বাড়াবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে যথেচ্ছ ছড়ানো হচ্ছে নানা রকম রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক । সে সব বৃষ্টিতে ধুয়ে জলাশয়ে মিশে তার পানিকে দূষিত করে তুলছে; কখনো বিষাক্ত কীটনাশক প্রবেশ করছে প্রাণিদেহে বা মানুষের শরীরে । বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যেসব খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে তাতে মেশানো হচ্ছে বহু ধরনের রাসায়নিক বস্তু; কয়েক লাখ ওষুধপত্র অপপ্রয়োগের মাধ্যমে বিষক্রিয়া ঘটাচ্ছে মানুষের শরীরে; কৃত্রিম রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি বাসন-কোসন, পোশাক-পরিচ্ছদ অনেক ক্ষেত্রে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে ।

৭. *জীবপ্রজাতির বৈচিত্র্য হ্রাসঃ* দীর্ঘদিনের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে বহু লক্ষ ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণিপ্রজাতির আজ উদ্ভব ঘটেছে । এসব প্রজাতি আবার সবই পরস্পর নানা অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা । আজ খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে মানুষ অল্প কিছু উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির ওপর বেশি করে গুরুত্ব দিচ্ছে, অন্য সব প্রজাতি তাতে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে । বনজঙ্গল কেটে ফেলায়, রাসায়নিক দূষণের কারণে এবং আরো নানাভাবে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণিপ্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে । এতে কিছুদিনের মধ্যেই পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে এক বড় রকম পরিবেশগত বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে; তাতে একদিন হয়তো মানুষের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়বে ।

৮. *অস্ত্রসজ্জা ও যুদ্ধপ্রস্তুতিঃ* বিভিন্ন সময়ে শান্তির নানা উদ্যোগের কথা শোনা গেলেও সারা পৃথিবী জুড়ে এখনো বিপুল আকারে অস্ত্রসজ্জা ও যুদ্ধপ্রস্তুতি চলছে। পৃথিবীর মোট বার্ষিক উৎপাদনের প্রায় ছ'শতাংশ ব্যয় হচ্ছে সামরিক খাতে; অথচ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হচ্ছে এর চেয়ে অনেক কম । আজকের আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র পরিবেশের বিপুল ক্ষতিসাধন করতে পারে; বিশেষ করে পরিবেশ ধ্বংস করতে পারে পারমাণবিক, রাসায়নিক

ও জীবাণু অস্ত্র। অথচ এসব অস্ত্র নির্মাণ অব্যাহত গতিতে চলেছে; পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার কারণে পৃথিবীতে ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পরিমাণ বাড়ছে।

নারীদের সংশ্লিষ্টতা

সমগ্র পৃথিবীতে যেমন, তেমনি বাংলাদেশেও নারীদের হার মোট জনসংখ্যার মোটামুটি অর্ধেক। এই নারীসমাজ নানা ধরনের উৎপাদন ও সেবামূলক কাজে পুরুষের মতোই জড়িত। এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশ্রমে নারীদের সংশ্লিষ্টতা অপেক্ষাকৃত কম হলেও কৃষিক্ষেত্রে, ফসল তোলার পর তার মাড়াই, গোলাজাত করা, প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন, গৃহস্থালী, সন্তানের পরিচর্যা, পশুপালন, জ্বালানি আহরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক জীবনধারায় নারীর ভূমিকা পুরুষের চেয়ে কম তো নয়ই বরং কোন কোন দিক দিয়ে পুরুষের চেয়ে বেশি। তার মধ্যে মাত্র দু'তিনটি দিক — যেমন জ্বালানি সংগ্রহ ও ব্যবহার, খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং সন্তান উৎপাদন ও পালন — বিবেচনা করলেও দেখা যাবে নারী সমাজ বর্তমান পরিবেশজনিত সমস্যার সঙ্গে কী গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

বাংলাদেশের মতো পৃথিবীর প্রায় সব কৃষিপ্রধান দেশেই জ্বালানি সংগ্রহের কাজটি রান্নাবান্নার মতোই প্রায় একচেটিয়াভাবে মেয়েদের ওপর পড়ে। অথচ বনজঙ্গল কমে আসার ফলে জ্বালানি সংগ্রহ করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। আমাদের দেশে গাছের ডালপালা, ঝরাপাতা আজ প্রায় সবটাই জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে; তার ফলে আগে এসব মাটিতে পচে গাছপালাকে যে পুষ্টি যোগাত তা ব্যাহত হচ্ছে। তেমনি গোবর জ্বালিয়ে ফেলার ফলে তা আর আগের মতো জমিতে সার যোগাতে পারছে না। বলা বাহুল্য উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার জ্বালানি সঞ্চয়ে এবং তার দক্ষ ব্যবহারে অবদান রাখতে পারত। কিন্তু এধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবনে তেমন উদ্যোগ নেয়া হয় নি; যেটুকুও বা উদ্ভাবিত হয়েছে তারও দেশব্যাপী ব্যবহারের বিষয়ে তেমন প্রচার ও উদ্যম নেই।

খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে নারীসমাজের ঐতিহ্যগত ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু একে তো অশিক্ষিত নারীসমাজে উন্নত পুষ্টিজ্ঞানের অভাব, তার ওপর অসাধু ব্যবসায়ীরা আজ খাদ্যদ্রব্যে ব্যাপকভাবে ভেজাল দিতে আরম্ভ করেছে — তার ফলে সমগ্র জনসমাজের স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। সুষম খাদ্য, বিভিন্ন বয়সের খাদ্য চাহিদা, শিশুদের জন্য মায়ের দুধের গুরুত্ব, খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণের উন্নত ব্যবস্থা, জীবাণু সংক্রমণ এসব বিষয়ে নারী সমাজের বিপুল অংশের তেমন ভাল জ্ঞান নেই। তার ফলে খাদ্যের উৎপাদন ও সুষ্ঠু ব্যবহার ব্যাহত হচ্ছে; যথেষ্ট অপচয়ও ঘটছে।

সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনে নারী সমাজের অবদান মুখ্য। এক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে শিক্ষা ও চেতনার অভাব জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাবার ব্যাপারে এক বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে পরিবার পরিকল্পনার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও এযাবৎ মাত্র ৩৪ শতাংশ সক্ষম দম্পতি জন্মশাসনের পদ্ধতি গ্রহণ করছে। অথচ অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে চীন, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে এই হার ৮০ শতাংশেরও ওপরে।

বলা বাহুল্য নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষার অভাব এক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। বাংলাদেশে এমনিতেই শিক্ষার হার খুব কম; কিন্তু তার মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার হার আরো বেশি কম। সমগ্র দেশে বয়স্ক সাক্ষরের হার মোটামুটি ৩০ শতাংশ হলেও পুরুষদের মধ্যে এই হার যেখানে প্রায় ৪০ শতাংশ সেখানে মেয়েদের হার মাত্র ২০ শতাংশের মতো। শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা স্বভাবতই পরিবেশের ভারসাম্য, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসংক্রান্ত জ্ঞান, সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতি থেকে নারীসমাজকে অনেকখানি বঞ্চিত রেখেছে; নানা ধরনের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে তাদের মুক্তিকে ব্যাহত করছে। নারী–পুরুষের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য এ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

কয়েকটি মূল সমস্যা

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কয়েকটি মূল পরিবেশগত সমস্যা হল জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি, জনসমাজের মধ্যে অশিক্ষা এবং জীবনমানের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারে পশ্চাদপদতা।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা এখন প্রতি বছর প্রায় ২.১ শতাংশ হারে বাড়ছে; অথচ উন্নত দেশগুলিতে (যেমন জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইডেন) জনসংখ্যার বৃদ্ধি ইতোমধ্যে প্রায় থেমে এসেছে। বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা আজ একান্ত জরুরি। নারীসমাজের সহযোগিতা ও সচেতন উদ্যোগ ছাড়া এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। আবার এই উদ্যোগকে ব্যাপক রূপ দিতে হলে সমগ্র জনসমাজে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুপ্রয়োগ ঘটিয়ে মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনার আয়োজন করতে হবে। বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়েও মাত্র ৭০ শতাংশ ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পায় — তাদের মধ্যে প্রতি পাঁচজনে তিনজন ছেলে, দু'জন মেয়ে। কিন্তু যারা বিদ্যালয়ে যায় তাদের মধ্যে পঁয়ত্রিশ শতাংশের মতো প্রাথমিক স্তর শেষ করে; বাকিরা তার আগেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে।

প্রাথমিক স্তরের পর শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অংশ গ্রহণের হার দ্রুত কমে যেতে থাকে। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েদের হার প্রতি তিন জনে একজন (অর্থাৎ দু'জন ছেলে, একজন মেয়ে), কলেজ পর্যায়েও তাই; বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রতি পাঁচজনে মাত্র একজন মেয়ে। মাধ্যমিক স্তরে যেসব ছেলেমেয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অর্ধেকের কম বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ পায়; অথচ এই বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচিতেই পরিবেশ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত।

আজকে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দারিদ্র, অজ্ঞতা এবং অশিক্ষাই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পরিবেশের দূষণ এবং অবনতির প্রধান কারণ। দারিদ্র দূর করার জন্য যেমন অর্থনৈতিক পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তেমনি শিক্ষা বিস্তার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশ্রয় গ্রহণেরও আয়োজন থাকতে হবে। আর এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় নারী–পুরুষের বৈষম্য নিরসনেরও ব্যবস্থা থাকা চাই। এই বৈষম্য শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে দূর করলেও চলবে না, সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় নারী সমাজের সমানাধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আজ পরিবেশ পরিস্থিতি যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে ভবিষ্যতে তা আরো জটিল হয়ে উঠতে পারে। আগামী দিনের পরিবেশ মূলত নির্ভর করবে আজকের শিশু–কিশোর ও তরুণ সমাজের ওপর। এই শিশু–কিশোর সমাজের ওপর বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নারীসমাজ। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চেতনা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে নারীসমাজের শিক্ষা–স্বাস্থ্য–চেতনার ওপর। এদিক থেকে দেখলেও নারীসমাজের মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত চেতনা বিস্তার আজ একান্ত জরুরি। তাঁরা যদি ব্যাপকভাবে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন তাহলে আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন দুঃসাধ্য হবে না।

নতুন দিগন্ত

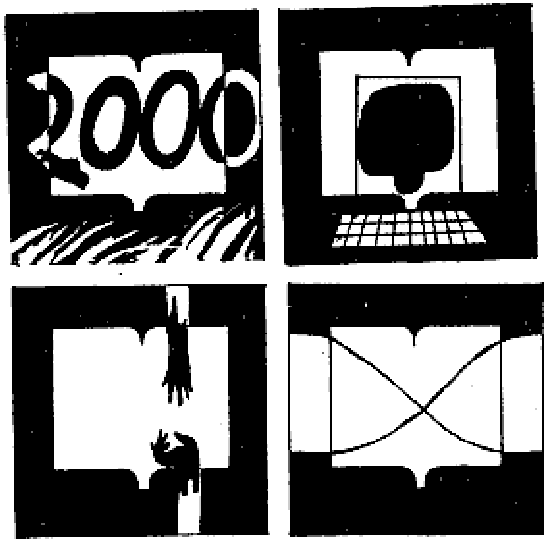

আরেক দশকের সামনে দাঁড়িয়ে

টালমাটাল একটি দশক আমরা দেখতে দেখতে পেরিয়ে এলাম। আশির দশক অভিধায় চিহ্নিত এই সময়ে গঙ্গা-যমুনা-মেঘনার বুক দিয়ে অনেক পানি গড়িয়েছে। দিগ্বিদিক আলুথালু করা অনেক আন্দোলন, অসংখ্য মানুষের ত্যাগ, যন্ত্রণা আর রক্তের বিনিময়ে দেশে দেশে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা আর শান্তির বিজয় পতাকা উড়েছে। এদেশের মাটিতে নুয়ে-পড়া-মানুষেরাও দেখতে শুরু করেছে উজ্জীবিত আশার আলো।

এমনি আরেক দশকের সামনে আমরা এবার দাঁড়িয়ে। এই নব্বইয়ের দশক আমাদের নিয়ে যাবে বিশ শতকের শেষ প্রান্ত অবধি। ২০০০ সাল — যেন মায়াবী একটি সংখ্যা! এই মোহনীয় সংখ্যাটিকে কেন্দ্র করে নেয়া হচ্ছে লোভনীয় নানা আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। 'সবার জন্য আশ্রয়', 'সবার জন্য খাদ্য', 'সবার জন্য বস্ত্র', 'সবার জন্য স্বাস্থ্য', 'সবার জন্য শিক্ষা'—সবই মিলবে সেদিন। যেন এই শতকের প্রান্তে শুধু নয়, সেইসঙ্গে এক 'সব পেয়েছির দেশে' পৌঁছে যাচ্ছে সারা দুনিয়ার মানুষ মাত্র আর একটি দশক পেরোলেই।

মানুষের সভ্যতা বহু হাজার বছরের পুরনো, কিন্তু আসলে এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য সুবিধে ইত্যাকার প্রয়োজন মেটানো কখনোই সম্ভব হয় নি। গত তিনশ বছরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিপ্লবের কল্যাণে আজই প্রথম মোটামুটি বাস্তবসম্মতভাবে সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য এসব লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা সম্ভব হচ্ছে। শুধু বিশ শতকের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে তিনগুণ ছাড়িয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও এই পাঁচশ কোটির বেশি মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের কৌশল আজ মানুষের আয়ত্ত; শুধু দেশে দেশে সম্পদ বন্টনের বৈষম্যই পৃথিবী থেকে ক্ষুধা আর দারিদ্র দূর করার পথে প্রধান বাধা।

বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে গত কয়েক দশক ধরে যে তীব্র সমরাস্ত্র প্রতিযোগিতা চলে এসেছে তার অর্থহীন নির্বুদ্ধিতা আজ স্পষ্ট। তেমনি প্রাকৃতিক সম্পদের আগ্রাসী লুণ্ঠন সারা পৃথিবীর জন্য কী ভয়াবহ পরিবেশগত বিপর্যয় ডেকে আনছে সে সত্যও আজ দিবালোকের মতো ভাস্বর। এ সবই ব্যয়বহুল উন্মার্গ-অস্ত্রসজ্জা বন্ধ করে সেই উদ্বৃত্ত অর্থ প্রকৃতি ও পরিবেশের গভীরতর অন্বেষা-উপলব্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়নে নিয়োগের সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

২০০০ সাল নাগাদ সারা পৃথিবী হয়তো গড়পড়তাভাবে সব-পেয়েছির-দেশে পৌঁছে যেতেও পারে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো এক অতি দরিদ্র দেশের পক্ষেও যে তা

অনিবার্যভাবে সম্ভব হয়ে উঠবে এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। এদেশের সীমিত পরিসরে জনসংখ্যার নিবিড়তা (প্রতি বর্গকিলোমিটারে আটশ'র ওপর) আজ পৃথিবীর একেবারে প্রথম সারিতে । আমাদের খনিজ, বনজ, জলজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদও অঢেল নয় । এসব সম্পদের গুণগত উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশের চেহারা বদলে দিতে পারে কেবল আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাতিয়ারে সজ্জিত নতুন দিনের মানুষ । সেই মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং মানুষের হাতে সে হাতিয়ার তুলে দেয়া এদেশের সামনে আজ একমাত্র দায়িত্বশীল পথ ; অথচ সে পথে আমরা আজো কি তেমন কোন পদক্ষেপ নিতে পেরেছি ?

পেছনে ফেলে আসা আশির দশকে বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রের পরিস্থিতি কি ছিল সেদিকে যদি তাকাই তাহলে তেমন কোন উজ্জ্বল ছবি চোখে পড়ে না । এই সময়ে কোন কোন দিকে কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছে সন্দেহ নেই । প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের সংখ্যা তেমন না বাড়লেও শিক্ষার্থী-সংখ্যা ১৯৮০ সালের মোটামুটি ৮২ লাখ থেকে বেড়ে ১৯৯০ সালে প্রায় ১১৯ লাখে দাঁড়িয়েছে । মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২২ লাখ থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩০ লাখ । এই বৃদ্ধির হার বছরে যথাক্রমে শতকরা পাঁচ ভাগ আর চার ভাগ । কিন্তু তারপরও প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে বয়ঃক্রমের মাত্র তিনজনে দু'জন আজ বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পাচ্ছে; মাধ্যমিক স্তরে এই হার চারজনে মাত্র একজন ।

উচ্চতর স্তরের শিক্ষায় এই বৃদ্ধির হার অবশ্য তুলনামূলকভাবে বেশি । উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এই সময়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,১৮,০০০ থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৫,৬৮,০০০ —অর্থাৎ বার্ষিক বৃদ্ধি শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ । ডিগ্রি স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,৮৩,০০০ থেকে বেড়ে হয়েছে মোটামুটি ২,৫৫,০০০ — বার্ষিক বৃদ্ধি শতকরা প্রায় ৪ ভাগ । বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে — ৩৭,০০০ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০,০০০-এর কাছাকাছি । উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এই বিস্তার দেশের জন্য আশা ও আনন্দের কারণ হতে পারত । কিন্তু এই সময়ে অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের তেমন বিকাশ না ঘটায় কেবল শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । সেইসঙ্গে সেশন জট ও সন্ত্রাস শিক্ষাঙ্গনে বিপুল হতাশা ও আতঙ্কের জন্ম দিচ্ছে ।

পরিমাণগত বিস্তারের পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মানের দিকে তাকালে সংকটের রূপটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে । প্রাথমিক স্তরে যত ছেলেমেয়ে ভর্তি হয় তার তিনজনে দু'জনই পাঁচ বছরের পুরো শিক্ষাক্রম শেষ করার আগেই নানা পর্যায়ে ঝরে যায় । মাধ্যমিক স্তরে ১৯৯০ সালে চারটি শিক্ষা বোর্ড মিলে যে মোট ৪,৩৬,০০০ শিক্ষার্থী শেষ পরীক্ষা দিয়েছিল তার মধ্যে উত্তীর্ণ হয় মাত্র ৩২ শতাংশ । বাকিরা অসাফল্যের ছাপ কপালে এঁকে বিদ্যালয় ছেড়ে যায় । উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও ফলাফল ছিল এমনি শোচনীয়। মোট ২,৯৪,০০০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয় মাত্র ৩০ শতাংশ ।

এই পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে এক ব্যাপক সামাজিক অবক্ষয় এবং সামগ্রিক শিক্ষাদান ব্যবস্থার ব্যর্থতারই পরিচয় দেয় । সেই সঙ্গে আরো এক বড় বিপদ আমাদের সামনে। সে হল বর্তমানে শিক্ষাদানের এবং সে শিক্ষার মূল্যায়নের যে ব্যবস্থা তাতে সচরাচর 'শেখা' আর 'মুখস্থ করা' প্রায় সমার্থক । স্বচ্ছ মুক্ত চিন্তা, অনুসন্ধিৎসা, অনুধাবন ও প্রয়োগ, সৃজনশীলতা — এসব বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যেন দুয়োরানীর আসনে । শিক্ষাটা যেন মূলত গলাধঃকরণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটা পরীক্ষাকেন্দ্রে ব্যাপক নকল প্রবণতার একটি অন্যতম কারণ । এমনি ছাঁচে-ঢালা দায়সারা শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে একুশ শতকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবীর উপযোগী নতুন মানুষ সৃষ্টি আদৌ সম্ভব বলে মনে হয় না ।

স্পষ্টতই এই ব্যবস্থার এক ব্যাপক রূপান্তর আজ জরুরি প্রয়োজন হয়ে উঠেছে । সে প্রয়োজন সকল মহলে স্বীকৃত, কিন্তু কী পদ্ধতিতে এবং কোন্ ধারার পরিবর্তন আনতে হবে সে বিষয়ে কোন ঐকমত্য নেই । বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর পরই মুক্তিযুদ্ধের ধারা অনুসরণ করে স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন একটি সামগ্রিক প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন । কিন্তু তার বাস্তবায়ন স্থগিত হয়ে যায় । এরপর আরো কয়েকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়; কিন্তু সেগুলো সবই হয় মূলত মৃতবৎসা ।

পরিবর্তন কি তা বলে আদৌ হয় নি ? না, তা নয় । সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রকল্প গৃহীত হয়েছে ; এ বিষয়ে আইনও প্রণীত হয়েছে । সরকারী গণসাক্ষরতা কর্মসূচি দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর আবার সীমাবদ্ধ আকারে চালু হয়েছে । মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এবং শিক্ষকদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ দেবার পদক্ষেপও গৃহীত হয়েছে ।

একইসঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সীমিত রেখে মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। প্রাথমিক শিক্ষার শুরু থেকে ইংরেজি এবং ধর্মীয় শিক্ষার নামে আরবি চালু হয়েছে । শিশুশিক্ষার স্তরে নানা ভাষার সমাহার ঘটালে যদি বুদ্ধিবৃত্তির দ্রুত বিকাশ ঘটত তাহলে বাংলাদেশের শিশুদের নিতান্ত সৌভাগ্যবান বলা যেতে পারত । কিন্তু এই পদক্ষেপের ফল উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের বিপরীত হবার সম্ভাবনাই বেশি ।

সম্প্রতি জাতিসংঘের উদ্যোগে '২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা' প্রবর্তনের এক ব্যাপক কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । বলা হয়েছে এই সময়ের মধ্যে সবদেশে নিরক্ষরের হার বর্তমান অঙ্কের অর্ধেকে নামিয়ে ফেলতে হবে; ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের অন্তত ৮০ শতাংশকে বিদ্যালয়ে আনতে হবে; এবং বয়স্কদের আজীবন পরিপূরক শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে । বাংলাদেশ আজ যে পর্যায়ে আছে তাতে তার পক্ষে এসব লক্ষ্য অর্জন প্রায় সাধ্যের অতীত । তবে বাংলাদেশ ২০০০ সালের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরের হার বাড়িয়ে অন্তত ৬০ শতাংশে এবং ২০১০ সালের মধ্যে অন্তত ৮০ শতাংশে না তুলতে পারার কোন কারণ নেই ।

সকলের জন্য শিক্ষার এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হলে আগামী দশক জুড়ে ব্যাপক ও বহুমুখী শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভৌত সুযোগ-সুবিধে যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি চাই শিক্ষকদের মান উন্নয়নের ব্যবস্থা;

উন্নত শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ; তদারকি ও পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন; সেই সঙ্গে প্রয়োজন নানা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষামূলক ও শিক্ষা-সহায়ক কার্যসূচি এবং সারা দেশব্যাপী এক ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন ।

এধরনের আন্দোলনের সংগঠন ও সাফল্যের জন্য যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সংকল্প প্রয়োজন বর্তমান পরিস্থিতিতে তা নিশ্চিত নয় । শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের জড়ত্ব যে কত গভীর ও সুদূরপ্রসারী তা উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার পরিস্থিতি থেকেই বোঝা যায় । গবেষণা ও নতুন জ্ঞানের অন্বেষা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্যতম প্রধান দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। অথচ বাংলাদেশের সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কর্মকান্ডে বার্ষিক যে অর্থবরাদ্দ তা লজ্জাজনকভাবে কম । সর্বশেষ ১৯৮৬-৮৭ সালের জন্য এ ধরনের হিসেব পাওয়া যায় । এবছর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দেশের সবক'টি বিশ্বদ্যিালয়ের ব্যয়নির্বাহের জন্য বরাদ্দ করেন যে ৮৫ কোটি টাকা, তার মধ্যে গবেষণার খাতে ব্যয় হয় মাত্র ৮ লক্ষ টাকা ।

এমনি সংকট শিক্ষার জন্য সামগ্রিক অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রেও । সাম্প্রতিককালে এখাতে বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে; কিন্তু ব্যয় বরাদ্দের তালিকায় শিক্ষাকে প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে দেশরক্ষা এবং সাধারণ প্রশাসন খাতের সঙ্গে । শিক্ষাক্ষেত্রে মোট জাতীয় আয়ের যে প্রায় দু'শতাংশ আজ বরাদ্দ, সে হার উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যেও একেবারে শেষের কোঠায় । অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে এখাতে ব্যয় মোট জাতীয় আয়ের তিন থেকে চার শতাংশ ।

এই পরিস্থিতি যেমন একদিকে আমাদের বিষণ্ন করে তেমনি আগামী দশকের জন্য কর্তব্যও নির্দেশ করে । সাম্প্রতিককালে অর্থনীতিবিদদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা ও জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে অর্জিত বুনিয়াদি শিক্ষার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে । এ ধরনের গবেষণার জন্য রবার্ট সলো (Robert Solow) নামে একজন মার্কিন অর্থনীতিবিদ ইতোমধ্যে নোবেল পুরস্কারও লাভ করেছেন । এথেকে বোঝা যায় বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার নিম্নমান এবং এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্গত অবস্থা নিছক সম্পর্কহীন নয় ।

কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে ধরলে বলা যায় এদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির একটি প্রধান চালিকা শক্তি হতে পারে শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যখন দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের হর্ম্যশোভা ও রাজপথের দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা নাগরিকদের মনে বিভ্রমের সৃষ্টি করে তখন তার পাশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দুর্গত দশা এবং শিক্ষকদের ম্লান মুখ বেদনাদায়ক বৈপরীত্য সৃষ্টি না করে পারে না ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বহিরঙ্গের চাকচিক্য অবশ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, তার অন্তরঙ্গের সুস্থতা ও শক্তিই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেয়। নতুন প্রজন্মের উপযুক্ত মানুষ গড়ার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি কিনা সেটাই আজ বড় প্রশ্ন ।

আগামী দশকের দিকে তাকালে আর সব কিছুকে ছাপিয়ে এই প্রশ্ন আজ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় ।

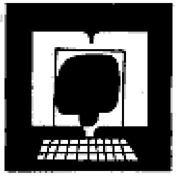

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও তৃতীয় বিশ্ব

মানুষের সভ্যতা যে বহু হাজার বছর ধরে অসংখ্য চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এগিয়েছে তাতে বরাবরই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কোন-না-কোনভাবে ছাপ ফেলেছে । সভ্যতার অগ্রযাত্রায় চারপাশের প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে, আর সেই সঙ্গে পরিবেশের নানা উপকরণকে সে ক্রমেই নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বেশি করে কাজে লাগিয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে পড়ে মানুষ নিজেও; তাই নিজের সম্বন্ধেও মানুষকে জানতে হয়েছে অনেক কিছু — সে জ্ঞানকেও মানুষ লাগিয়েছে তার কাজে। সামাজিক জীবন যাপনের তাগিদে এসব জানাজানির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের মনোভঙ্গি আর মূল্যবোধ —তার ন্যায়-অন্যায়ের উপলব্ধি, কল্যাণ-অকল্যাণের চেতনা, সুন্দর-অসুন্দরের অনুভূতি । এই উপলব্ধি, চেতনা আর অনুভূতির জগৎ কখনো রূপ নিয়েছে অধ্যাত্ম-চিন্তার, কখনো দর্শনের, কখনো শিল্প-সংস্কৃতির ।

মানুষ এ পৃথিবীতে আসে এক সহজাত প্রবল কৌতূহল সঙ্গে নিয়ে । তারই তাড়নায় সে ক্রমাগত নিজের চারপাশের পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তোলে, সে সব প্রশ্নের জবাব খোঁজে । এভাবে সে যে জ্ঞান অর্জন করে চলে তাকেই আমরা বলি বিজ্ঞান । এই জ্ঞান অর্জনের জন্য যে সংশয় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতি দীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছে তাও এই বিজ্ঞানের অঙ্গ । আর চারপাশের প্রকৃতিকে মানুষ তার প্রয়োজনে যে নানা কলাকৌশলের সাহায্যে কাজে লাগায় বা রূপান্তরিত করে চলে তাই প্রযুক্তি বা প্রয়োগ-কৌশল ।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সঙ্গে থাকলেও মানুষ যে বরাবর সচেতন ও সুপরিকল্পিতভাবে তাদের কাজে লাগাতে পেরেছে তা বলা যায় না । প্রথমদিকে জীবন ধারণের জন্য মানুষ যেসব প্রয়োগ-কৌশল কাজে লাগাত সেগুলি অন্য প্রাণীদের সহজাত জৈব তাড়না থেকে তেমন উন্নত মানের নয় । সে ধরনের কৌশল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত অন্য নানা প্রাণীর মধ্যেও কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায় । পিঁপড়ে, মৌমাছি, বাবুই পাখি আশ্রয় নির্মাণে আশ্চর্য নিপুণতার পরিচয় দেয়; খাদ্য সংগ্রহের জন্য বানর প্রভৃতি প্রাণী কখনো কখনো রীতিমতো কূটবুদ্ধির আশ্রয় নেয়; খাদ্য সংগ্রহ বা আত্মরক্ষার জন্য হাতিয়ারের ব্যবহার প্রাণিজগতে একেবারে বিরল নয় । কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা ও মেধার বিকাশের ফলে অবশেষে এই সহজাত বুদ্ধিনির্ভর সনাতন প্রযুক্তির জায়গায় ক্রমে ক্রমে যুক্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচাই হওয়া বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটেছে ।

সচরাচর ধরে নেয়া হয় পরীক্ষা-নির্ভর বিজ্ঞানের উদ্ভব আজ থেকে মোটামুটি আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক সভ্যতার সময়ে । তখন থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ জ্ঞান মানুষ পরবর্তীকালের কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে; এসব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমন্বয়ে প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও এক সময় গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে । অবশ্য বিজ্ঞানের উদ্ভবের আগে মানুষ যেসব প্রযুক্তি কাজে লাগাত তাতেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নেহাত কম নয়। পশুপালন, কৃষি ও বয়ন, গৃহ নির্মাণ, মিসরের পিরামিড, চীনদেশে কাগজ, কম্পাস ও বারুদের ব্যবহার, ধাতুর ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানুষের গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, কৃৎকৌশল ও সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় । কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে যুক্তি ও গণিতের সিঁড়ি বেয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার যে বুদ্ধিগত উৎকর্ষ গ্রীকরা অর্জন করেছিল তা মানুষকে বিজ্ঞানের সাধনায় এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রায় বিপুল এক ধাপ এগিয়ে দেয় ।

তারপর থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে মেলবন্ধন ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হতে থাকে । প্রথম প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দুয়েরই অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে ঘটেছে; কিন্তু তারপর তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হয় তত তাদের উভয়ের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হতে থাকে । ষোড়শ শতকে বিশ্বজগতের স্বরূপ সম্বন্ধে কোপার্নিকাস-কেপলারের বৈপ্লবিক আবিষ্কারের সময় থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত; সপ্তদশ শতকে গালিলিও-নিউটন তাকে দৃঢ় ভিতের ওপর দাঁড় করান । এই সময়ের বিজ্ঞান বিপ্লবের পরপরই অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে প্রযুক্তি বিপ্লব দেখা দেয় । পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার নানা নতুন জ্ঞান যন্ত্র-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে উৎপাদন-শক্তির বিপুল বিকাশ ঘটাতে আরম্ভ করে । নতুন নতুন ধরনের জ্বালানির উদ্ভব এক্ষেত্রে ক্রমেই নতুন মাত্রা যোগ করতে থাকে ।

উনিশ শতকে এসে বিদ্যুৎ ও বেতার তরঙ্গের প্রয়োগ শুরু হয় । সেই সঙ্গে জীববিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটতে আরম্ভ করে । জীবাণু-তত্ত্বের উদ্ভব ও প্রয়োগ রোগ প্রতিরোধ আর চিকিৎসাতেই শুধু বিপ্লব ঘটায় না, শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রেও বিপুল রূপান্তর আনে । বিশ শতকে এসে কোয়ান্টাম তত্ত্ব, পরমাণু-কেন্দ্রের রহস্য উদ্‌ঘাটন, বংশগতির ওপর নিয়ন্ত্রণ, মহাকাশ বিজয়, কমপিউটার ও লেজার প্রযুক্তি প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেছে ।

কখনো বলা হয় আজ আমরা তৃতীয় প্রযুক্তি বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছি । প্রথম প্রযুক্তি বিপ্লব ঘটেছিল আজ থেকে দু'শ' বছর আগে —আঠার শতকের শেষে — যাতায়াত, খনি ও শিল্প-উৎপাদনে বাষ্পশক্তির প্রয়োগের ফলে । দ্বিতীয় প্রযুক্তি বিপ্লব দেখা দেয় একশ' বছর আগে — উনিশ শতকের শেষে — যোগাযোগ, নির্মাণ, যন্ত্রপাতি, আলোকসজ্জা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার এবং রসায়নের নানা আশ্চর্য আবিষ্কারের ফলে অসংখ্য ধরনের নতুন গুণাগুণযুক্ত কৃত্রিম বস্তু উদ্ভাবনের মাধ্যমে । এবার কমপিউটার ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে তৃতীয় প্রযুক্তি বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কুপ্রভাব

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিপুল অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে মানুষের জীবনে নানা ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে । যাতায়াত ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে, নানা বিচিত্র গুণাগুণের বস্তুসামগ্রী মানুষের আয়ত্ত হয়েছে, রোগ-ব্যাধির ওপর কর্তৃত্ব যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তা অতীতে অকল্পনীয় ছিল । এসবের ফলে শুধু বিশ শতকের মধ্যেই পৃথিবীর জনসংখ্যা তিনগুণের ওপর বেড়েছে, মানুষের গড়পড়তা আয়ু প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, নগরায়ণের মাত্রা প্রায় চারগুণ বেড়ে মোট জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে ।

এই সময়ে শুধু যে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যই বিপুলভাবে বেড়েছে তা নয়, বৃদ্ধির হারও ক্রমেই দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়েছে । তার ফলে যেখানে বহু লক্ষ বছর আগে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে শুরু করে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা হয়েছিল মোটামুটি একশ' কোটি, সেখানে আজ পৃথিবীতে একশ' কোটি মানুষ বাড়ছে মাত্র দশ বছরে ।

গত দু'তিনশ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপুল বিস্তার যে মানুষের জন্য কেবলই নিরঙ্কুশ কল্যাণ বয়ে এনেছে তা অবশ্য বলা যায় না । বরং ইতোমধ্যে নানা ধরনের গুরুতর সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে । তার মধ্যে প্রধান হল –

ক. জনসংখ্যার বিপজ্জনক বৃদ্ধি;

খ. পরিবেশের অবনতি ও তার ভারসাম্যে বিপর্যয়;

গ. দেশে দেশে মানুষের জীবনমানে বিপুল বৈষম্য সৃষ্টি; এবং

ঘ. মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা ও বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা ।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি ক্রমেই বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে । পৃথিবীর জনসংখ্যা পাঁচশ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে । আর মাত্র পঞ্চাশ বছরে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে হাজার কোটি ছাড়িয়ে যাওয়া বিচিত্র নয় । এ সমস্যার একটি কারণ হল যে-হারে মানুষ স্বাস্থ্য সুবিধে ও চিকিৎসা প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার মৃত্যুর হার কমিয়ে এনেছে সেভাবে জন্মহার হ্রাসের সময়োচিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে নি । সাম্প্রতিককালে উন্নত দেশগুলিতে এক্ষেত্রে বেশ কিছুটা অগ্রগতি ঘটলেও অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলিতে জনসংখ্যা এখনও বিপুলভাবে বাড়ছে ।

খানিকটা এই জনসংখ্যার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীতে পরিবেশের অবনতি ক্রমেই বিপজ্জনক মাত্রায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে । নানা খনিজ সম্পদের বেশুমার ব্যবহার এসব অনবায়নযোগ্য শক্তির পুঁজি নিঃশেষ করে আনছে; বন-বনানী, বন্যপ্রাণী

ইত্যাদি নির্বিচারে ধ্বংস হচ্ছে; রাসায়নিক, তেজস্ক্রিয় ও আরো নানা ধরনের দূষণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে — এতে প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে সমগ্র পৃথিবীর আবহমণ্ডলে নানা ধরনের বিপর্যয়কর পরিবর্তনের আশঙ্কা সৃষ্টি করছে ।

আদিম সমাজে মানুষে মানুষে এক ধরনের সাম্য বিরাজ করত । সভ্যতার বিস্তার নানা জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসম বিকাশের সমস্যা সৃষ্টি করেছে । বর্তমানকালে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি এই অসম বিকাশের ধারাকে যেন আরো বাড়িয়ে তুলছে । তীব্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মুখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রসর জ্ঞান আজ গুটিকয়েক দেশ এবং সে সব দেশের স্বল্পসংখ্যক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে ।

এমনি আরেক বিপদ দেখা দিয়েছে পৃথিবীতে মারণাস্ত্রের সম্ভার বেড়ে ওঠা এবং তার ফলে বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবার কারণে । মানুষের হাতে আজ যে পরিমাণ ধ্বংসের উপকরণ পুঞ্জীভূত হয়েছে তাতে কোন উন্মত্ত রাষ্ট্রনায়কের নির্বোধ তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ফলে সমগ্র মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয় । এ বিষয়ে বিশ্ব মানব-সমাজের বিবেচনা বুদ্ধি জাগ্রত না হলে বিশ্ব শান্তি রক্ষা দুরূহ হয়ে উঠতে পারে ।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি এধরনের সমস্যার জন্য অনেকখানি পরিমাণে দায়ী হলেও এসব সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেবার কথা কেউ ভাবছেন না, এবং সেটা মনে হয় সম্ভবও নয় । বরং একদিকে আরো নতুন জ্ঞান ও নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং সে সব জ্ঞানের সঙ্গে মানবিক চেতনার সমন্বয় আর অন্যদিকে সমাজ সংগঠনের যে সব ত্রুটি আজ নানা জটিলতার জন্ম দিচ্ছে তার সংশোধনের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হতে পারে । সেটা কতখানি সম্ভব এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জন্য এক্ষেত্রে কর্মকৌশল কি হতে পারে সে সব প্রশ্ন আজ আমাদের জন্য এক অতি জরুরি বিবেচ্য বিষয় ।

গভীর জ্ঞানের জগৎ

বিশ শতকের বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য হল পরমাণুর গোপন কন্দর থেকে মহাবিশ্বের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত স্থানকালে আজ মানুষের গভীর অনুসন্ধান প্রসারিত হয়েছে । মানুষ দেখছে আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটছে তার মূল কারণ খুঁজতে হলে ক্রমে ক্রমে গিয়ে ঢুকতে হয় বস্তুর গভীর থেকে গভীরতম জগতে । আকাশটা নীল, অস্তগামী সূর্য লাল, কোন বস্তু হালকা, কোনটা ভারি, কোন জিনিসের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ বয়, কোনটার ভেতর দিয়ে বয় না —এসব রহস্যের সমাধানের জন্য যেতে হয় বস্তুর একেবারে ভেতরে । তারপরও রহস্য শেষ হয় না, প্রশ্নের জবাবে আসে আরো প্রশ্ন । যেতে হয় আরো গভীরে । তারপর দেখা যায় মহাবিশ্বের নানা ঘটনা ঘটছে শতাব্দীর পর শতাব্দী, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে; এতকাল ধরে চলেছে নানা বস্তু আর নানা শক্তির মিথস্ক্রিয়া । প্রশ্ন ওঠেঃ কী তার প্রকৃতি, কী তার নিয়ম-কানুন, কী তার ফলাফল? সে সব প্রশ্ন থেকে দেখা দেয় আরো গভীর নানা প্রশ্ন ।

নানা বস্তু, নানা প্রক্রিয়ার রীতিনীতি বুঝতে গিয়ে আমরা এক সময় পৌঁছই কখন কিভাবে এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি, কখন কিভাবে এর একদিন সমাপ্তি ঘটবে —এমনি সব মৌলিক প্রশ্নে । আজকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, বিজ্ঞানীরা এমনি সব অতি মৌলিক প্রশ্নের বাস্তবসম্মত সমাধান খোঁজা শুরু করেছেন । সারা পৃথিবীতে কি পরিমাণ বস্তু আছে, কোন্ কোন্ পরিণতির ধারায় সেসব আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, আগামী দিনে বিশ্বের বস্তুপুঞ্জের পরিণতি কি ঘটতে পারে — এসব বড় মাপের প্রশ্নও আজ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার, ধরাছোঁয়ার মধ্যে এসে পৌঁছেছে ।

বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে জেনেছেন যে, আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার কোটি বছর আগে — অর্থাৎ সূর্য এবং সৌরজগতের যখন সৃষ্টি তার প্রায় তিনগুণ সময় আগে — এক মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বজগতের উৎপত্তি । আর সেই অতি প্রবল বিস্ফোরণের ধাক্কায় বিশ্বজগতের যে বিস্তার শুরু হয়েছে তা আজো ঘটে চলেছে । গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সি সব বিপুল বেগে সরে যাচ্ছে পরস্পর থেকে । এই মহাবিস্তার কি চিরকালই চলতে থাকবে ? না কি বস্তুপুঞ্জ তার নিজেরই মহাকর্ষজনিত টানে আবার সঙ্কুচিত হতে হতে অবশেষে আজ থেকে পাঁচ হাজার কোটি বছর পর শেষ হবে আর এক প্রচণ্ড মহাসঙ্কোচনে ? —এ প্রশ্নের জবাব নির্ভর করছে মহাবিশ্বে মোট কি পরিমাণ বস্তু আছে তার ওপর। মহাবিশ্বের সব দৃশ্য আর অদৃশ্য বস্তুর পরিমাণ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাপজোখ চলেছে । আর এই যে বিশ্বজগতের গভীর মহাসত্যকে নিয়ে আসা কল্পনার জগৎ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ধরাছোঁয়ার স্তরে এও কি মানুষের মেধা আর মননের জগতের কম বড় এক বিস্ময় ?

কখনো কখনো মনে হতে পারে বিজ্ঞানীদের এসব ধারণা বুঝি কেবলই আকাশ-কুসুম কল্পনা । কিন্তু বিজ্ঞানীরা যখন বহু বছর আগে থেকে আঁকজোখ কষে বলেন অমুক তারিখের অমুক সময়ে সূর্যে গ্রহণ লাগবে, তখন সত্যি সত্যি তো তা ঘটে । বিজ্ঞানীরা তাঁদের আঁকজোখ থেকে বলেছিলেন বস্তুর বিপরীতধর্মী এক ধরনের পদার্থ আছে যাদের বলা যায় প্রতিবস্তু । পরে পরীক্ষায় সত্যি সত্যি পাওয়া গেল সে প্রতিবস্তু । বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বস্তুকে ধ্বংস করে পাওয়া যেতে পারে বিপুল শক্তি । একদিন সত্যি তা বাস্তবে ঘটল । এমন সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে বিজ্ঞানের তত্ত্বের কঠিন বাস্তবতা আর তার বিপুল শক্তিতে তো আর সন্দেহ করা চলে না । আর এই বিজ্ঞান যে শুধু মানুষের দিনানুদিন যাপনের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত নয় তাও তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

সমাজের ওপর এসবের কি কোন প্রভাব পড়ে ? — সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে যে অসংখ্য উপাদান আমরা ব্যবহার করছি সে সব বিষয়ে জ্ঞান মানুষের জীবনে নিশ্চয়ই প্রভাব ফেলে । কিন্তু বিশ্বজগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানও যে মানুষের জীবনে কম প্রভাব

বিস্তার করে তা তো বলা যায় না। ষোল আর সতের শতকে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার মানুষের চিন্তার জগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল; তাকে সমসাময়িক ইউরোপে যে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ ও মুক্তবুদ্ধির বিস্ফোরণ ঘটে তা থেকে পৃথক করে দেখা চলে না। ধর্মীয় অন্ধতা আর কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছিল; ডাইনি বলে মানুষ পুড়িয়ে মারা, যুগযুগ ধরে ধর্মযুদ্ধ চলা বন্ধ হয়েছিল। জীবাণুতত্ত্বের আবিষ্কারের ফলে প্লেগ আর মহামারীতে পতঙ্গের মতো হাজার হাজার মানুষের প্রাণনাশের অবসান ঘটেছিল। জীবজগতের ক্রমবিকাশের তত্ত্ব মানুষের সামনে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক গভীর জ্ঞানের জগৎ আলোকিত করে তুলেছিল। বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে এসব জ্ঞান কবি-সাহিত্যিকদের প্রকৃতি বর্ণনাতেও এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। বিজ্ঞান মানুষকে শুধু মুক্ত স্বাধীন দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ দেয় নি, তাকে এক নতুন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নেও উদ্বেলিত করেছে।

সেদিনের সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন কি এই বিশ শতকের শেষে এখনও সত্যি? সভ্যতার নানা জটিল সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা কি আজো তেমনি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারি? — বিশেষ করে আমরা যারা অবহেলিত, পশ্চাদপদ তৃতীয় বিশ্বের মানুষ তাদের সামনে ভবিষ্যৎ কি? সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানের এমন কিছু নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে যা মানুষের সামনে সত্যি সত্যি এক উদ্দীপ্ত অনাগত কালের প্রতিশ্রুতি আরো উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছে।

নতুন ধরনের বস্তু : শক্তির নতুন উৎস

এককালে মানুষের নির্মাণ, হাতিয়ার প্রভৃতি প্রয়োজনের উপকরণ ছিল প্রকৃতিতে যেসব বস্তু লভ্য সে সবই — কাঠ, পাথর, ব্রোঞ্জ, লোহা ইত্যাদি। রসায়ন শাস্ত্রের অগ্রগতির ফলে উনিশ শতকে নতুন নতুন গুণাগুণযুক্ত কৃত্রিম বস্তুর উদ্ভব ঘটতে থাকে। এসব কৃত্রিম বস্তু শুধু যে প্রাকৃতিক বা খনিজ নানা বস্তুর চেয়ে বেশি টেকসই, হালকা বা সুলভ তা নয়, তাতে রয়েছে এমন সব নতুন গুণাগুণ যা প্রাকৃতিক কোন বস্তুতে পাওয়া দুঃসাধ্য।

বিশ শতকের মাঝামাঝিও মনে করা হত ধাতুর ব্যবহার যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে পৃথিবীর সঞ্চিত ধাতুসম্পদ অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভবের ফলে ধাতুর ব্যবহার ক্রমেই কমে আসছে। যেমন টেলিফোন যোগাযোগের জন্য আগে যেক্ষেত্রে এক টন তামার তারের প্রয়োজন হত সেখানে আজ মাত্র চল্লিশ কেজি পরিমাণ কাচতন্তুর সাহায্যেই সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। চুলের মতো সরু বিশুদ্ধ কাচের তন্তুর মধ্য দিয়ে সূক্ষ্ম আলোক-স্পন্দনের মাধ্যমে এক সঙ্গে হাজার হাজার টেলিফোন সংযোগ সম্ভব হচ্ছে। এমনি সরু কাচতন্তুর সঙ্গে সূক্ষ্মমাত্রায় এরবিয়াম নামে একটি ধাতু মিশিয়ে দিলে তার ভেতর ঐ এরবিয়াম পরমাণু স্পন্দিত হয়ে আলোক সঙ্কেতকে দশ হাজার গুণ পর্যন্ত বিবর্ধিত করে। এর ফলে টেলিফোন লাইনে ব্যয়বহুল অ্যামপ্লিফায়ার বসাবার আর প্রয়োজন হয় না।

এই শতাব্দীর শুরুতে বেকেলাইট নামে প্রথম কৃত্রিম প্লাস্টিক তৈরি হয়। আজ অজস্র ধরনের গুণাগুণসম্পন্ন প্লাস্টিক তৈরি হচ্ছে। এসব প্লাস্টিক অনেক ক্ষেত্রে ধাতুর চেয়ে সস্তা, হালকা, মজবুত এবং টেকসই। এখন বিজ্ঞানীদের কোন বস্তুর নতুন নতুন ব্যবহার উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে হয় না, বরং নির্দিষ্ট ধরনের কাজের জন্য ঠিক প্রয়োজনীয় গুণাগুণযুক্ত বস্তু তাঁরা তৈরি করে নেন।

এতদিন আমরা জানতাম অনেক ধাতব বস্তুর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ সহজেই চলাচল করে। অথচ কাঠ, কাচ, সিরামিক প্রভৃতি বস্তুর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না, তাই এদের বলা হয় অপরিবাহী। এসব অপরিবাহী বস্তুতে বিদ্যুতের রোধ বেশি; পরিবাহী বস্তুতে বিদ্যুতের রোধ কম। তবে সব বস্তুই বিদ্যুৎ প্রবাহে কিছু বাধা দেয়, আর এই রোধের কারণে দীর্ঘ পথে পরিবাহীর ভেতর বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় ঘটে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে কেমারলিং অনেস নামে একজন ওলন্দাজ বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছিলেন পারদ প্রভৃতি কোন কোন ধাতুকে ঠান্ডা করে পরম শূন্য তাপমাত্রার (সেলসিয়াস মাপে শূন্যের নিচে ২৭৩ ডিগ্রি) কাছাকাছি নামিয়ে আনলে তাতে অতিপরিবাহিতা দেখা দেয়, অর্থাৎ তার রোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এমন শৈত্য পাওয়া যায় কেবল অতি মূল্যবান তরল হিলিয়াম ব্যবহার করে — তাই এই গুণকে কোন ব্যবহারিক কাজে লাগানো হল অবাস্তব। অবশেষে আশির দশকের মাঝামাঝি ইউরোপে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকজন বিজ্ঞানী এমন কিছু সিরামিক বস্তু তৈরি করতে সমর্থ হলেন যা অপেক্ষাকৃত সুলভ তরল নাইট্রোজেনের চেয়ে বেশি উষ্ণতায় অতিপরিবাহী হয়ে ওঠে। তারপর অন্যান্য বিজ্ঞানী আরো এমন সব বস্তু উদ্ভাবন করেছেন যা প্রায় ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায়ও বিদ্যুতের রোধ অতিক্রম করে অতিপরিবাহিতা লাভ করে। এর ফলে ইলেকট্রনিক্স-এর ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটতে চলেছে। রোধের কারণে বিদ্যুৎশক্তির যে বিপুল অপচয় ঘটে তা দূর হলে বিদ্যুৎচালিত নানা যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের ক্ষেত্রেও ঘটবে গুণগত পরিবর্তন।

নতুন ধরনের অতিপরিবাহী বস্তু নির্মাণ ছাড়াও সিরামিকজাতীয় বস্তুর আরো অসংখ্য নতুন ব্যবহার আবিষ্কৃত হচ্ছে। মোটর ইঞ্জিনে আজ ব্যবহৃত হচ্ছে অতি তাপসহ হালকা সিরামিক। কারবনতন্তু, কাচতন্তু, প্লাস্টিকদ্রব্য, অর্ধপরিবাহী প্রভৃতি নানা গুণাগুণযুক্ত বস্তু মানবদেহের নানা অংশ নির্মাণ এবং আরো অসংখ্য প্রয়োজনে যুক্ত হচ্ছে। ঠিক তেমনিভাবে উদ্ভাবিত হচ্ছে নানা আশ্চর্য গুণাগুণযুক্ত নতুন নতুন সংকর ধাতু।

আজ যে সব ট্রানজিস্টার এবং কমপিউটার চিপ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তারও সৃষ্টি এক নতুন ধরনের বস্তু থেকে — সেগুলো অর্ধপরিবাহী। সাধারণ বালি থেকে সিলিকন শোধন করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার ফলে এই অর্ধপরিবাহী বিপ্লব সম্ভব হয়েছে। নতুন নতুন ধরনের চিপ কমপিউটারের জগতে বিপুল রূপান্তর আনছে। সিলিকনের বদলে গ্যালিয়াম আর্সেনাইড প্রভৃতি নতুন ধরনের বস্তু থেকে ক্রমেই আরো

শক্তিশালী, দ্রুত কার্যক্ষম চিপ তৈরি হচ্ছে। এসব কমপিউটার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন বিপ্লব ঘটাচ্ছে।

সভ্যতার অগ্রগতির ধারায় নতুন নতুন বস্তুর মতোই নানা ধরনের নতুন শক্তির উৎসকে মানুষ ক্রমাগত আয়ত্ত করে চলেছে। প্রথমে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হত কাঠ। এরপর এল কয়লা আর সেইসঙ্গে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ব্যবহার। তারপর এল খনিজ তেল এবং অন্তর্দহন ইঞ্জিন। উনিশ শতকের শেষে বাষ্পীয় আর অন্তর্দহন ইঞ্জিনের শক্তি রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করল বিদ্যুৎ শক্তিতে। বিশ শতকের মাঝামাঝি এসেছে পরমাণু-শক্তি। এর মধ্যেই আজ সারা পৃথিবীর প্রায় বিশ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে পরমাণু-শক্তি থেকে।

বর্তমান শতাব্দীতে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে দ্রুত, সেই সঙ্গে শিল্প কারখানারও দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে। দুই বৃদ্ধির ফলাফল যুক্ত হয়ে এই এক শতাব্দীর মধ্যেই পৃথিবীতে শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার বেড়েছে প্রায় চল্লিশ গুণ। কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যাপক ব্যবহার সেইসঙ্গে কিছু জটিল পরিবেশগত সমস্যার জন্ম দিয়েছে — পরিবেশের দূষণ ও আবহাওয়ার উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে 'গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া'। সেই সঙ্গে কোন কোন জীবাশ্ম জ্বালানি (যেমন তেল ও গ্যাস) নিঃশেষ হয়ে আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পরমাণু-শক্তির ব্যবহারও গুরুতর তেজস্ক্রিয়-দূষণের আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে।

এসব কারণে আজ নতুন ধরনের জ্বালানি উৎসের সন্ধান শুরু হয়েছে। এর মধ্যে সৌর-শক্তি, পরমাণু-সংযোজনভিত্তিক ফিউশন-শক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গবেষণায় যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। বিশেষ করে জোর দেয়া হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের দিকে। সেই সঙ্গে শক্তি সঞ্চয়, বিতরণ ও ব্যবহারের আরো দক্ষ পন্থা উদ্ভাবন নিয়েও দুনিয়ার নানা দেশে গবেষণা চলছে। পরিবেশ দূষণ সীমিত রাখা এবং জ্বালানি সংরক্ষণের জন্য জীবাশ্ম-জ্বালানির ব্যবহার কমাবার নানা প্রযুক্তি আজ বিভিন্ন দেশে উদ্ভাবিত হচ্ছে।

জৈবপ্রযুক্তির সম্ভাবনা ও বিপদ

বিজ্ঞানকে মোটামুটি মাত্র দু'টি ভাগে ভাগ করতে হলে সে দু'টি হবে ভৌতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান। বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি ঘটেছে তাতে নেতৃত্ব দিয়েছে মূলত ভৌতবিজ্ঞান। বিশ শতকের শুরুতে বংশগতির তত্ত্ব উদ্ভবের ফলে পরিকল্পিত উপায়ে উদ্ভিদ আর প্রাণিদেহের উন্নয়ন সাধনে ব্যাপক অগ্রগতি সম্ভব হয়ে ওঠে। তারপর এক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ঘটল পঞ্চাশের দশকে জীবকোষের কেন্দ্রে ক্রোমোজোম তন্তুর মধ্যে বংশগতির বাহক ডি.এন.এ. উপাদানের রাসায়নিক গঠন আবিষ্কৃত হবার ফলে। জানা গেল, উদ্ভিদ আর প্রাণীর সব গুণাগুণ নিহিত ডি.এন.এ.-র পেঁচানো সুতোয় 'অসংখ্য জিনকণার মধ্যে লুকানো রাসায়নিক সংকেতে। তারপর দেখতে দেখতে দু'দশকের মধ্যে এসব সংকেতে পরিবর্তন ঘটিয়ে উদ্ভিদ আর প্রাণিদেহে মানুষের ইচ্ছেমতো গুণাগুণ সঞ্চার সম্ভব হয়ে উঠল।

সাধারণভাবে কোন জীবদেহের সাহায্য নিয়ে আর কোন বস্তু উৎপাদনের পদ্ধতিকে বলা হল জৈবপ্রযুক্তি — আর তার বিশেষ রূপ হিসেবে কোষকেন্দ্রের জিনকণার পরিবর্তন ঘটিয়ে জীবদেহে গুণগত রূপান্তর ঘটানোকে বলা হল জিন-প্রকৌশল।

কৃষি ও চিকিৎসাশাস্ত্রে জৈবপ্রযুক্তি ইতোমধ্যে বিরাট রকম পরিবর্তন আনতে আরম্ভ করেছে। ষাটের দশক থেকে ধান, গম প্রভৃতিতে সংকরায়নের মাধ্যমে নতুন উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভব ঘটায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন আজ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত তিন দশকে পৃথিবীর জনসংখ্যা মোটামুটিভাবে দ্বিগুণ হলেও এই সময়ে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় আড়াইগুণ। তার ফলে পৃথিবীব্যাপী যেখানে খাদ্যশস্যের নীট ঘাটতি ছিল, সেখানে আজ খাদ্যশস্যের নীট উদ্বৃত্ত ; বাংলাদেশের মতো কোন কোন দেশে যে এখনো ঘাটতি রয়েছে এটা বরং ব্যতিক্রম — আর এই ঘাটতি মিটিয়ে ফেলে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া, এমনকি উদ্বৃত্ত হওয়া আজকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাহায্যে সহজেই সম্ভব।

চিকিৎসা ক্ষেত্রেও আমরা আজ এসে দাঁড়িয়েছি বিরাট এক পালাবদলের মুখোমুখি। জীবজগতের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে এতকাল ধরে ছিল অলংঘ্য দেয়াল। পেঁপেগাছ, বটগাছ, কেঁচো, বেড়াল, হাতি — এসব উদ্ভিদ আর প্রাণী যুগ যুগ ধরে তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিচরণ করেছে এ পৃথিবীতে। কিন্তু এই পার্থক্যের দেয়াল আজ ক্রমেই ভেঙে পড়তে আরম্ভ করেছে। জীবদেহের রহস্য উন্মোচন করে মানুষ তাদের আজ নতুন করে গড়তে শুরু করেছে। জিন-সংযোজন পদ্ধতিতে যে কোন প্রজাতির জীবকে আজ অন্য যে কোন প্রজাতির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া সম্ভব হয়ে উঠছে। অণুজীব থেকে বিশেষ গুণের আধার জিন ছেঁটে নিয়ে বসানো হচ্ছে কোন উদ্ভিদের দেহে, উদ্ভিদের গুণ বসানো হচ্ছে প্রাণীর দেহে।. উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহের যেসব গুণাগুণ অবাঞ্ছিত সেগুলো আমরা আজ মুছে দিতে পারি, আর তার জায়গায় যোগ করতে পারি আমাদের পছন্দমতো গুণাগুণ।

জিন-প্রকৌশলের সাহায্যে আজ তৈরি হচ্ছে নানা নতুন নতুন ওষুধ আর টিকা; আগামী দশ থেকে বিশ বছরের মধ্যে হেপাটাইটিস, সর্দি, উচ্চ রক্তচাপ, ম্যালেরিয়া, ডায়াবেটিস, ক্যানসার, হৃদ্‌বৈকল্য, পার্কিনসন্স ব্যাধি প্রভৃতি আজকের অধিকাংশ দুরারোগ্য রোগ প্রতিরোধ বা নির্মূল করার মতো অস্ত্র মানুষের আয়ত্তে এসে যাবে।

জীবদেহের সব গুণাগুণ যেহেতু মূলত বংশগতির মাধ্যমে পাওয়া, কাজেই বংশগতির কৌশল ব্যবহার করে এসব গুণাগুণ বদলানোও যেতে পারে। আজকে একটি গাছের কাণ্ডে যেমন ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে আব সৃষ্টি হয়, আগামীতে হয়তো তেমনি মানুষের দেহের আঙুল, ফুসফুস বা যকৃৎ বদলে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় কোন অণুজীব ব্যবহার করলেই চলবে। শুধু যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গই এভাবে বদলে দেয়া যাবে তাই নয়, বদলানো চলবে চোখের বা চুলের রঙ, সুরেলা বা বেসুরো গলা, এমনকি মনের ধাঁচও।

ব্যাকটিরিয়া বলতে যে এতকাল প্রধানত রোগ উৎপাদনকারী অণুজীব মনে করা হত, সে ধারণা আজ পালটে যাচ্ছে । ব্যাকটিরিয়ার ভেতর প্রয়োজনীয় জিনখণ্ড ভরে তাকে আজ নানা উদ্ভিদে যোগ করা হচ্ছে । তার ফলে উদ্ভিদে জন্মাচ্ছে নানা প্রয়োজনীয় গুণাগুণ —যেমন রোগ বা পোকামাকড় প্রতিরোধের ক্ষমতা, বেশি ফলন, খরা বা প্লাবন সহ্য করার শক্তি । এ ধরনের পরিবর্তন উদ্ভিদের বেলায় সম্ভব হলে প্রাণিদেহে — এমন কি মানুষের শরীরে — ঘটাতে না পারার কোন কারণ নেই ।

একটি মানুষের দেহের সব গুণাগুণ নিহিত তার জীবকোষের ক্রোমোজোম তন্তুর বুকে লাখ খানেক জিনখণ্ডে। প্রতিটি মানুষের এসব জিনখণ্ডে লুকানো রয়েছে মোটামুটি তিনশ' কোটি তথ্য । মানুষের দেহের সমগ্র জিন সমাবেশের পূর্ণাঙ্গ একটি মানচিত্র তৈরির প্রকল্প ইতোমধ্যে হাতে নেয়া হয়েছে । এতে দরকার হবে বিরাট আকারের উদ্যোগ, খরচও হবে বিপুল অঙ্কের । 'হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট' নামে এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সংস্থা আজ এ নিয়ে কাজ করে চলেছে; সমগ্র প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়াবে প্রায় তিনশ' কোটি ডলার । একুশ শতকের গোড়াতেই দেহের সমগ্র জিন-মানচিত্রের রহস্যভাণ্ডার মানুষের আয়ত্ত হবে বলে আশা করা যায় । তখন প্রতিটি জিনের পরিচয়, গুণাগুণ আর অবস্থান এসে যাবে মানুষের নখদর্পণে । কোথায় কোন্ জিনের ত্রুটির কারণে একজন মানুষ বর্ণান্ধ বা দুরারোগ্য রক্তাল্পতার শিকার অথবা তার হৃদ্‌বৈকল্যের বা বিশেষ কোন ধরনের ক্যানসারের প্রবণতা আছে তা জানা যাবে সহজেই; আর তখন সেই জিন বা জিনসমষ্টি বদলে ফেলে তাকে এই বিপদের আশঙ্কা মুক্ত করা তেমন দুঃসাধ্য হবে না ।

উদ্ভিদের জিনে রদবদল ঘটাবার একটা ফল হবে এই যে, বিভিন্ন দেশের চাষবাস বদলে যাবে । শীতের দেশের ফসল আর শাক-সবজি জন্মানো যাবে গরম দেশে । গরম দেশের শাক-সবজি, ফলমূল জন্মাবে শীতের দেশে । কোথায় কোন্ গাছ লাগানো হবে তা নির্ভর করবে চাষীদের ইচ্ছার ওপর । এমনভাবে ফসল বাছাই করা হবে যাতে তা সূর্যালোকের সুবিধে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে; তাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়বে বহু গুণে । তাছাড়া ফসলের পুষ্টিগুণও বাড়ানো যাবে । হয়তো শাক-সবজি থেকেই পাওয়া যাবে মাংসের মতো প্রোটিন, স্বাদও বাড়ানো চলবে পছন্দমতো । সে সব ফসল ফলাতে সার আর কীটনাশক লাগবে খুব কম; ফসল সংরক্ষণ করা যাবে দীর্ঘকাল । ফসলে পরিবর্তনের ফলে পশুপাখিতেও পরিবর্তন দেখা দেবে; সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটবে নানা দেশের মানুষের জীবনযাত্রার ধরনে ।

কিন্তু এসব নতুন ধরনের সংকর ফসলের একটা সমস্যা এই যে, এগুলোর বীজ থেকে পরবর্তী প্রজন্মে হুবহু একই ধরনের ফল পাওয়া যায় না । সেজন্য যেসব বড় বড় কোম্পানি এসব ফসল উদ্ভাবন করেছে তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে নতুন মূলবীজ । অর্থাৎ নতুন জাতের সব ফসল ক্রমেই কুক্ষিগত হয়ে পড়তে পারে কিছু একচেটিয়া মালিকের হাতে । এমনিভাবে একচেটিয়া কর্তৃত্বের কবলে পড়বে নতুন ধরনের সব পশুপাখিও ।

এসব পরিবর্তনের মধ্যে অনেকে আরো নানা বিপদের সম্ভাবনা দেখছেন । উদ্ভিদ আর প্রাণিদেহে যেসব পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে তা কি শেষ পর্যন্ত সবই মানুষের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে ? ধরা যাক কোন আলুর গাছে জিন বদলে দেয়া হয়েছে । তার ফলে সেই আলুর ফুল থেকে রেণু আলুজাতীয় অন্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে তাতে যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটিয়ে বসবে না তার নিশ্চয়তা কি ? যেসব অণুজীব বা ভাইরাসের দেহে বিজ্ঞানীরা আজ জিনগত পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন তা থেকে ওইসব জিন যদি অন্য অণুজীব বা ভাইরাসের দেহে চালান হয়ে যায় তাহলে তার ফল কি হবে ? তাছাড়া মানবদেহের ত্রুটি মেরামতের জন্য বা উন্নয়ন সাধনের জন্য জিনগত যেসব রূপান্তর ঘটানো হবে তা যে সবই মানুষের জন্য শেষ পর্যন্ত কল্যাণকর হবে তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই । এসব নীতিগত প্রশ্ন নিয়ে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানী সমাজ ও অন্যান্য মহলে আজ তীব্র বিতর্ক চলছে । অবশ্য অতীতে বিজ্ঞানের অন্যান্য অনেক আবিষ্কার নিয়েও রক্ষণশীলরা প্রথম প্রথম নানা রকম ভীতিজনক আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে, তবে তাতে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেমে থাকে নি ।

কমপিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি

জ্ঞান লাভের জন্য তথ্য আহরণ একটি প্রাথমিক প্রয়োজন । মানুষ চিরকালই তার চারপাশের প্রকৃতি থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছে, নানা সংকেত এবং ভাষার ব্যবহার করে সে সব তথ্যকে পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করেছে । মুখের ভাষা থেকে ক্রমে ক্রমে উদ্ভব ঘটেছে লিখিত ভাষার, তারপর ছাপাখানার — এভাবে তথ্য বিনিময়ের বিস্তার বেড়েছে । কিন্তু মাত্র গত কয়েক দশকের মধ্যে ইলেকট্রনিক্স, টেলিযোগাযোগ ও কমপিউটারের সংযোগের ফলে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক রূপান্তরের সূচনা ঘটেছে । এসব প্রযুক্তির সাহায্যে অকল্পনীয় পরিমাণ তথ্যকে মানুষ আজ একযোগে সঞ্চয় ও ব্যবহার করতে পারছে; নানা দেশের ক্রমবর্ধমান তথ্যসম্পদ যে কোন মানুষের কাছে লভ্য হয়ে উঠছে ।

বিপুল পরিমাণ তথ্য দ্রুত প্রক্রিয়াজাত করার জন্য কমপিউটারের উদ্ভব ঘটেছে মাত্র চল্লিশের দশকের শেষে । প্রথম প্রথম কমপিউটার ছিল বিশাল আকারের, তাতে বিদ্যুতের ব্যবহার হত বিপুল আর ব্যয়ও ছিল বিরাট অঙ্কের । কিছুদিনের মধ্যে ট্রানজিস্টার ও ইলেকট্রনিক চিপ উদ্ভাবনের ফলে কমপিউটারের আকার ছোট হতে আরম্ভ করে, তার শক্তিও বাড়ে । সত্তরের দশকের শেষ ভাগ থেকে কমপিউটার ঘরে ঘরে আসন গ্রহণ করতে থাকে । আজ তা ছোট হতে হতে অবশেষে ঘুরছে মানুষের হাতে হাতে । কমপিউটারের সঙ্গে যোগ হয়েছে ভিডিও, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃত্রিম উপগ্রহ, লেজারযুক্ত কমপ্যাক্ট ডিস্ক । মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করা যাচ্ছে । তথ্য ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক রূপান্তর এসেছে ।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও এর ফলে পরিবর্তন আসছে। উন্নত দেশে ঘরকন্নার অনেক কাজ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কমপিউটার ব্যবস্থা দিয়ে। অনেক যানবাহন চলছে স্বনিয়ন্ত্রণে। ব্যাঙ্কে মানুষের বদলে কাজ করে দিচ্ছে কমপিউটার, শিল্পকারখানায় মানুষের কাজ করছে রোবট। শ্রমসাধ্য কাজ থেকে মানুষ সরে গিয়ে যুক্ত হচ্ছে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করার কাজে। আগামী দিনে আরো অনেক বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটবে। টেলিফোনে হয়তো দেখা যাবে পরস্পরকে। খুদে টেলিফোন স্থান পাবে হাতঘড়িতে, হয়তো টাই-পিনে। তা আপনা থেকেই বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের মধ্যে দোভাষী হয়ে কথা তরজমা করে দেবে। টেলিফোনের মাধ্যমেই হয়তো ডাক্তার রোগীর তাপমাত্রা, রক্তচাপ, কার্ডিওগ্রাফ এসব তথ্য পেয়ে যাবেন — তারপর যথাবিহিত চিকিৎসার নির্দেশ দিতে পারবেন।

এককালে জনবসতি গড়ে উঠত যেসব জায়গায় যোগাযোগের সুবিধে ছিল তেমন এলাকায়— যেমন নদীর তীরে, রাস্তার সংযোগস্থলে। আজ ইলেকট্রনিক্স যোগাযোগের কল্যাণে যে কোন জায়গায় জনবসতি গড়ে ওঠা সম্ভব হয়ে উঠেছে। এমনকি নগরকেন্দ্রে সব অফিস স্থাপন করতে হবে এ ধারণাও আজ বদলে যাচ্ছে। কমপিউটার যোগাযোগের মাধ্যমে বাসস্থান ও কর্মস্থানের পার্থক্য ক্রমেই ঘুচে যেতে আরম্ভ করেছে।

এ ধরনের অগ্রগতির ফলে তথ্যব্যবস্থা আজ হয়ে উঠছে আধুনিক সমাজের স্নায়ুকেন্দ্র। এই স্নায়ুকেন্দ্রকে শক্তিশালী করার ওপরই নির্ভর করছে শিক্ষা, গবেষণা, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন — এমনকি সমাজ ও সভ্যতার সংগঠন। এই প্রযুক্তি যেসব দেশের আয়ত্ত হবে তারা অধিকারী হবে বিপুল পরিমাণ শক্তির। অন্য দেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগও তারা পেয়ে যাবে। এতকাল কৃষিপণ্য, খনিজ এবং শক্তি ছিল কোন দেশের অর্থনীতির প্রধান উপকরণ। আজ ক্রমেই সে অবস্থা বদলে যাচ্ছে। সারা পৃথিবী ক্রমাগত যোগাযোগের জালে পরস্পর সন্নিহিত হয়ে ওঠায় তথ্য হয়ে উঠছে অর্থনীতির প্রধান কাঁচামাল। তথ্যনির্ভর এক নতুন ধরনের সভ্যতার দিকে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে। আর যেহেতু তথ্য সঞ্চয়ের কোন বস্তুগত সীমারেখা নেই কাজেই এক্ষেত্রে অগ্রগতিরও কোন সীমানা টানা যায় না।

পরিবেশের ভারসাম্য ও প্রকৃতি সংরক্ষণ

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি শুধু উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে না, মানুষের জন্য নানা নতুন নতুন সমস্যারও জন্ম দিচ্ছে। বিগত তিন-চার দশকে সারা পৃথিবীতে পরিবেশ সম্পর্কে নতুন সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবী জুড়ে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং বেপরোয়া শিল্প-কারখানা বিস্তারের ফলে পৃথিবীর বস্তুসম্পদ যেভাবে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এবং পরিবেশের দূষণ সর্বব্যাপ্ত হয়ে পৃথিবীকে মনুষ্যবাসের অযোগ্য করে তুলছে তা এই শতকের মাঝামাঝি থেকে ক্রমেই স্পষ্ট হয়। পঞ্চাশের দশকে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন আরম্ভ হলে সমগ্র পৃথিবীকে বাইরে থেকে একত্রে দেখা এবং বায়ুমণ্ডলের অসংখ্য মাপজোখ একযোগে নেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। এসব মাপজোখের সঙ্গে কমপিউটার প্রযুক্তির যোগ ঘটার ফলে বিপুল পরিমাণ তথ্যকে অল্প সময়ে প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব হয় মহাকাশে। ষাটের দশকের শেষে মানুষ যখন নভোযানের ছোট ভেলায় চড়ে পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশে যাত্রা করে তখন নভোলোকের বিশাল পটভূমিতে পৃথিবীও যে একটি সীমাবদ্ধ পরিসরের স্বনির্ভর সপ্রাণ ভেলা এ সত্য মানুষের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানীরা আজ জেনেছেন যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কারবন ডাই-অক্সাইড এবং আরো ক'টি এমন গ্যাস আছে যেগুলি সূর্যের হ্রস্ব মাপের আলোকরশ্মিকে পৃথিবীর ওপর পড়তে বাধা দেয় না, কিন্তু সে রশ্মি যখন পৃথিবী থেকে বড় মাপের তাপরশ্মি হিসেবে প্রতিফলিত হয় তখন তাকে শোষণ করে নেয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পৃথিবীতে ব্যাপক আকারে কয়লা প্রভৃতি খনিজ জ্বালানির ব্যবহার এবং বন নিধনের ফলে বায়ুমণ্ডলে এধরনের তাপশোষক গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে উঠছে। তাতে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। আগামীতে এই উষ্ণতা বৃদ্ধির হার দ্রুততর হবে, পৃথিবীর গড় উষ্ণতা আরো বাড়বে; এতে পৃথিবীর জলবায়ুতে বড় রকম ওলট-পালট ঘটবে — বিভিন্ন দেশে কৃষির ওপর তার ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

এমনি আরেক সমস্যার কথা আজ বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাওয়া তথ্যের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। সে হল পৃথিবীর উঁচু বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের একটি হালকা স্তর আছে, এটি সূর্যরশ্মির অতিবেগুনি অংশ শুষে নিয়ে পৃথিবীর প্রাণী ও উদ্ভিদকুলকে এই তীব্র রশ্মিতে ঝলসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু আজকাল রেফ্রিজিরেটর ও অন্যান্য শিল্পকাজে সি.এফ.সি. এবং অন্য আরো কিছু এমন গ্যাস ব্যবহৃত হয় যা উঁচু আকাশে উঠে এই ওজোন স্তর ধ্বংস করে দিচ্ছে। দক্ষিণ ও উত্তর মেরু এলাকার ওজোন স্তরে এর মধ্যেই বিরাট ফোকর দেখা দিয়েছে। ফল হিসেবে আগামী কয়েক বছরে পৃথিবীতে ক্যানসার ও অন্যান্য রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে।

পরিবেশের দূষণ, বন বিনাশ এবং আরো নানা কারণে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি আজ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। এটাও পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হবার একটি অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে। জীবজগতের বৈচিত্র্য নষ্ট হলে শুধু যে মানুষের জীবনযাত্রার মানেরই অবনতি ঘটবে তা নয়, মানুষের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে।

এসব আবিষ্কারের ফলে আজ দুনিয়াজোড়া উদ্যোগ চলছে এমন উন্নয়ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করার যাতে পরিবেশের ওপর তার ক্ষতিকর বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া না পড়ে, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না হয় এবং পরিবেশের সম্পদ আগামী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা যায়।

তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞান–প্রযুক্তি

এসব দৃষ্টান্ত থেকে এটা স্পষ্ট যে, আগামী দিনে বিজ্ঞান–প্রযুক্তির বিকাশের নতুন বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। তার প্রভাব তৃতীয় বিশ্বের ওপর কতখানি বা কিভাবে পড়বে সে প্রশ্নও স্বভাবতই দেখা দেয়।

পৃথিবীতে বিজ্ঞান–প্রযুক্তির বিকাশ আজ সন্দেহাতীতভাবে দৃশ্যমান। কিন্তু দৃশ্যমান শুধু এই বিকাশের বিপুলত্ব নয়, এর অসমতাও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম জার্মানি প্রভৃতি গুটিকতক দেশে গড়পড়তা মাথা পিছু আয়ের হার আজ বছরে পনের হাজার ডলারের ওপর। কিন্তু সেই সঙ্গে বাংলাদেশ, ভারতসহ পৃথিবীর এক–তৃতীয়াংশ মানুষ রয়েছে চরম দারিদসীমার নিচে —তাদের মাথা পিছু আয় সাড়ে তিনশ ডলারের কম।

উন্নত দেশগুলোতে বিজ্ঞানের আশ্চর্য বিকাশের ফলে ভোগ্যপণ্যের যে অভূতপূর্ব প্রাচুর্য সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ভোলা যায় না যে, পৃথিবীতে আশি কোটির বেশি লোক আজ অনাহারের শিকার, একশ কোটি আজো নিরক্ষর। উন্নত দেশগুলো যেখানে প্রতিদিন অস্ত্রসজ্জার জন্য ব্যয় করে দুশ কোটি ডলার আর উত্তেজক পানীয়ের জন্য ত্রিশ কোটি ডলার, সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোর গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৮০ জন মানুষের কাছে জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ পানি আজো লভ্য নয়।

মোট কথা মাত্র গুটিকতক দেশে পৃথিবীর মোটামুটি এক–চতুর্থাংশ মানুষের হাতে আজ বন্দী হয়ে আছে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা মানুষের প্রায় সমগ্র বিজ্ঞানের ঐতিহ্য আর সম্পদ। প্রতি বছর পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়নে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তার শতকরা ৯৫ ভাগের ওপর ব্যয় করে এই দেশগুলি; আর উন্নয়নশীল দেশের বাকি তিন–চতুর্থাংশ মানুষের জন্য ব্যয় হয় বাকি মাত্র শতকরা ৫ ভাগ। সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর জ্ঞান তাই মূলত কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে উন্নত দেশগুলোর হাতে।

এই সমস্যাটি আজ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি দুনিয়াজোড়া এর বিস্তার। আর এ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন দেশে দেশে বিজ্ঞানী আর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা। দুনিয়ার তিন–চতুর্থাংশ মানুষকে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অবারিত আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত রেখে সত্যি কি পৃথিবীর কল্যাণের কথা চিন্তা করা যায়? উন্নত দেশগুলো বিজ্ঞানের অসম ও বৈষম্যমূলক বিকাশের ফলে যেসব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বা পরিবেশগত সমস্যার জন্ম দিচ্ছে তার দায় উন্নয়নশীল দেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া কি যুক্তিযুক্ত বা নীতিসম্মত? —আর তার চেয়েও যে প্রশ্ন আজ বড় হয়ে উঠেছে সে হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ আজ যত ব্যাপ্তি লাভ করছে, উন্নত আর উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বিভেদ না কমে যেন ততই আরো বেড়ে চলেছে; মানুষের জীবনযাত্রার মানে শুধু নয়, বিকাশের সম্ভাবনাতেও এই বৈষম্য ক্রমেই দুস্তর হয়ে উঠছে।

কিছুদিন আগে প্রফেসর আবদুস সালাম তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন পৃথিবীতে মানুষ আছে দু'জাতের। এক জাতে রয়েছে উন্নত বিশ্বের এক–চতুর্থাংশ বাসিন্দা। তারা বাস করে পৃথিবীর স্থলভাগের দুই–পঞ্চমাংশ এলাকায় আর নিয়ন্ত্রণ করে পৃথিবীর ৮০ শতাংশ সম্পদ। আর দ্বিতীয় জাত হল বাকি তিন–চতুর্থাংশ মানুষ যারা বাস করে পৃথিবীর তিন–পঞ্চমাংশ এলাকায়। এরা হল 'আল–মুসতাদোফিন'— অর্থাৎ বঞ্চিত মানুষের দল। এই দু'জাতের মানুষের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল তাদের আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা আর উদ্দীপনায়—যার উৎস হল মূলত আধুনিক বিজ্ঞান–প্রযুক্তির জ্ঞান ও প্রয়োগ–কুশলতার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেকার পার্থক্য। উন্নয়নশীল দেশগুলির মানুষদের ভাগ্যকে যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁদের আজ এক মৌলিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে — এই বঞ্চিতদের তাঁরা আধুনিক বিজ্ঞান–প্রযুক্তি সৃষ্টি, অর্জন ও প্রয়োগের সুযোগ দিতে চান কি চান না।

প্রফেসর সালাম যে দু'ধরনের মানুষের কথা বলছেন তাদের মধ্যে এমনি পার্থক্য যে চিরকাল ছিল তা নয়। বরং আজ যারা উন্নয়নশীল দেশ বলে পরিচিত ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে তাদেরই কোন কোনটি সভ্যতার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে পথ দেখিয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে। কিন্তু উত্তরের কিছু দেশ আজ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাতিয়ার অর্জন করে এগিয়ে গিয়েছে দক্ষিণের অধিকাংশ দেশের চেয়ে। সেসব দেশে বিজ্ঞান–প্রযুক্তির বিকাশ যত বেশি হয়েছে, তত পিছিয়ে পড়েছে দক্ষিণের দেশগুলি; তত বিশাল হয়েছে উত্তর আর দক্ষিণের দু'ধরনের দেশের মধ্যে পার্থক্য। আজকের উন্নত প্রযুক্তির যুগে এই পার্থক্য আরো বৃদ্ধির সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলি জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি পরিমাণ সম্পদ বিনিয়োগ করে তার হিসেব নিলে তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার কারণ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গড়পড়তা হিসেব ধরলে দেখা যায় উন্নত ও উন্নয়নশীল দু'ধরনের দেশই তাদের মোট দেশজ উৎপাদনের ছ'শতাংশের মতো ব্যয় করে সামরিক খাতে। শিক্ষাখাতে উন্নত দেশগুলির ব্যয়ের হার পাঁচ শতাংশের মতো, উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে চার শতাংশের কম (বাংলাদেশে এখাতে ব্যয় মাত্র দু'শতাংশ)। স্বাস্থ্যখাতে উন্নত দেশগুলির গড় ব্যয় পাঁচ শতাংশের কাছাকাছি, উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে দেড় শতাংশের মতো। কিন্তু বিজ্ঞান–প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই পার্থক্য যত বিশাল, এমন আর কোন ক্ষেত্রে নয়। উন্নত দেশগুলি সাধারণত বিজ্ঞান–প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয় করে মোট দেশজ উৎপাদনের দু' থেকে তিন শতাংশ। উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এই ব্যয়ের হার এর মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ। বাংলাদেশেও এখাতে ব্যয় এমনি শেষের সারিতে — মোট দেশজ উৎপাদনের ০.৩ শতাংশের নিচে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এত কম হারে অর্থ বিনিয়োগ করে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান–প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার আশা দুরাশা মাত্র।

অথচ আজ এক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলি নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা না করলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় কেবলই পিছিয়ে পড়া আর পরনির্ভরশীল হয়ে থাকা তাদের একমাত্র ভবিতব্য হয়ে দাঁড়াবে। পাশ্চাত্যের কোন কোন উন্নত দেশ আজ ব্যাপক সমরসজ্জার নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করে তাদের সামরিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেসামরিক উৎপাদনে লাগাবার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তাদের ভোগবাদী অর্থনীতিকে সংযত না করলে যে পরিবেশের ব্যাপক বিপর্যয় রোধ করা দুঃসাধ্য হবে—এবিষয়েও এসব দেশে আজ সচেতনতা গড়ে উঠছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিও তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং জীবনযাত্রার ধারায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকারের তালিকায় একেবারে প্রথম সারিতে না বসালে আগামী দিনে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রগতির পথে এগোনো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তৃতীয় বিশ্বের নেতৃস্থানীয়দের অনেকের ধারণা উন্নত দেশ থেকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ধার করে অথবা খয়রাত হিসেবে নিয়ে তাঁরা আগামী একুশ শতকে পাড়ি জমাতে পারবেন। কিন্তু গত কয়েক দশকের উন্নয়নে সাহায্যের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ আশা দুরাশা মাত্র। প্রথমত উন্নত দেশগুলির শিল্পপতিরা তাদের মুনাফার স্বার্থে অনুন্নত দেশগুলিকে সত্যিকার বিজ্ঞান-প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ব্যাপারে সাহায্য দিতে মোটেই আগ্রহী নয়। দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্য দেশে যেসব গবেষণা পরিচালিত হয় তা প্রধানত সে সব উন্নত দেশের জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে—তাদের কর্মসূচি মূলত তাদেরই আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন আজকের পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ব্যাধির অর্ধেকই দেখা যায় প্রধানত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, পীতজ্বর প্রভৃতি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক লোক মৃত্যু বরণ করে; কিন্তু এসব রোগের টিকায় তেমন মুনাফা নেই বলে পাশ্চাত্য দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের রোগ সম্বন্ধে গবেষণায় অর্থবিনিয়োগে আগ্রহী নয়। পৃথিবীতে আজ চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণায় যত অর্থ ব্যয় হয় তার মাত্র তিন শতাংশ হয় এসব গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের জন্য। একারণে পৃথিবী থেকে এসব রোগ নির্মূল বিলম্বিত হচ্ছে।

সারা পৃথিবীতে আজ কত প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে তার নির্ভরযোগ্য হিসেব পাওয়া দুঃসাধ্য। আনুমানিক হিসেব হল ত্রিশ লাখ থেকে এক কোটি। এর মধ্যে মাত্র চার লাখ প্রজাতির উদ্ভিদ এবং এগার লাখ প্রজাতির প্রাণী মিলিয়ে মোটামুটি পনের লক্ষ প্রজাতির জীব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে জানেন। প্রজাতির সংখ্যা সম্পর্কে অনিশ্চয়তার একটি কারণ হল এসব প্রজাতির অধিকাংশেরই আবাস গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে — অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের দেশে। এসব উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি শুধু বংশগতির ঐশ্বর্যের সম্ভার নয়, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় নানা রাসায়নিক উপাদানেরও বিপুল ভাণ্ডার। রসায়ন শাস্ত্রে বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও আজও সব ওষুধের এক-চতুর্থাংশের মূল উপাদান আসে গাছ-গাছড়া থেকে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের রহস্যের শতকরা একভাগও এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে উদঘাটিত হয় নি। অথচ শুধু সাম্প্রতিককালেই কফি, কোকো, পাট, চা, রাবার এমনি কিছু উদ্ভিদের ব্যবহার বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে কি বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে তা তো আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

তৃতীয় বিশ্বের নেতৃস্থানীয়দের অনেকের ধারণা আমরা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহারিক অবদানকে কাজে লাগাবার জন্য নেব, কিন্তু সেজন্য মৌলিক বিজ্ঞানের বা গবেষণার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, এ ধারণা একান্তই ভ্রান্ত। কেননা আজ যা মৌলিক বিজ্ঞান বলে গণ্য, আগামী দিনে তাই দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য প্রযুক্তি। আজকের দিনে যেসব দক্ষ প্রতিযোগিতামূলক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে তার সবই অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞাননির্ভর। কাজেই একদিকে যেমন দেশজ সনাতন নানা প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজন, তেমনি সেই সঙ্গে নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উদ্ভাবন, বিস্তার ও প্রয়োগের ক্ষমতা আয়ত্ত না করে কোন দেশের পক্ষেই আজ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়া এবং আধুনিক জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্ঞান আয়ত্ত করার জন্য শুধু গুটিকতক উচ্চমানের বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করলেই চলতে পারে, এই পুরনো ধারণাও আজ ক্রমেই অচল হয়ে উঠছে। পরিবার পরিকল্পনা, উন্নত কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগ, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখা গেছে সমগ্র জনসমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও চেতনার বিস্তার ছাড়া আজকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবীতে কোন জনগোষ্ঠীর পক্ষে টিকে থাকা দুঃসাধ্য। সেজন্য ব্যাপক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জনসম্পদের বিকাশ ঘটাতে হবে; শিক্ষা ব্যবস্থায় একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষায় বিজ্ঞানকে প্রধান ভূমিকায় বসাতে হবে। শুধু শিক্ষা ব্যবস্থায় নয়, তার বাইরেও সমগ্র জনসমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত না হলে সে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

আজ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কল্যাণকর শক্তি ও সম্ভাবনা যেমন বিস্তৃত হচ্ছে তেমনি বাড়ছে তার অকল্যাণের ক্ষমতা। শিল্প প্রসারের ফলে পরিবেশ দূষণ বেড়ে উঠছে, জৈবপ্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে কৃষিতে এবং জীবদেহের ওপর যে প্রভাব পড়তে পারে তাতে নানা নৈতিক সমস্যার উদ্ভব ঘটছে; যুদ্ধাস্ত্রের বিস্তারের ফলে সামরিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিশ্বে বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এসব বিপজ্জনক প্রভাবকে প্রতিরোধ করে মানব সভ্যতাকে কল্যাণ ও প্রগতির পথে এগিয়ে নেওয়া কেবল এক আধুনিক বিজ্ঞানের সংস্কৃতিতে লালিত সচেতন জনসমাজের পক্ষেই সম্ভব।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি আজ মানুষের সামনে নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই ভবিষ্যতে সংকট আর সম্ভাবনা একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে । জন-বিস্ফোরণ ও খাদ্য সমস্যা এখনও রয়েছে । কিন্তু সেইসঙ্গে আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রমাণ করেছে এসব সমস্যার সমাধান মানুষের অসাধ্য নয় । ইতোমধ্যে অনেক দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি স্তিমিত হতে হতে একেবারে শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে; আগামীতে অন্যান্য দেশেও তা ঘটবে । সমগ্র পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য সমস্যা আজ আর তেমন কোন সমস্যা নয় । পরিবেশের অবনতি বিশ্বময় যে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে তার সমাধানও আজ মানুষের আয়ত্ত । গত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা প্রমাণ দেয় যে, পারমাণবিক যুদ্ধ ও বিশ্ব ধ্বংসের আশঙ্কাকেও সচেতন বিশ্বসমাজের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব ।

সেই সঙ্গে এটাও ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি আজ যে সব সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার সমাধান শুধু বিজ্ঞান-প্রযুক্তি থেকে পাওয়া দুঃসাধ্য হবে । রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাচ্ছে নানা জটিলতা; বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে উদ্ভব ঘটছে নানা নৈতিক সমস্যার । বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অসম বিকাশে সৃষ্ট বিশ্বব্যাপী বৈষম্য দূর করার সমস্যা ক্রমেই এক প্রধান আন্তর্জাতিক কর্মসূচির অঙ্গ হয়ে উঠছে ।

আগামী দিনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবন আরো সমৃদ্ধ হবে একথা বলা যেতে পারে, কিন্তু আরো সহজ ও সরল হবে কিনা তা বলা শক্ত । সম্ভবত জীবন সহজ না হয়ে বরং আরো জটিল হবে । কিন্তু কোন কল্পলোকের প্রত্যাশায় না থেকে এই জটিলতার জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়াই হবে বাস্তবসম্মত পন্থা । সংকটকে অতিক্রম করে আগামী দিনের সম্ভাবনার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে । তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সামনে এছাড়া কোন সহজ সরল পথে আগামী শতাব্দীর দিকে এগিয়ে যাবার উপায় নেই । বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সাধনার পথে এগিয়ে যাওয়াই তাদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং বিকাশের একমাত্র সম্মানজনক পথ ।

একুশ শতকের মুখোমুখি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র একটি জনসমাজের উন্নত জীবনের জন্য আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত । কিন্তু এই উন্নত জীবনের জন্য আরেকটি অতি আবশ্যকীয় শর্ত হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে অগ্রগতি । মানুষ সভ্যতার অগ্রযাত্রায় সংস্কৃতির নানা উপকরণ নির্মাণ করেছে । তার ভাষা ও সাহিত্য, কৃষি ও পশুপালন, চিত্রকলা ও সংগীত —এ সবই মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করেছে । এক ধরনের সনাতন বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির উদ্ভবও ঘটেছিল মানুষের সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে । আজ থেকে বহু হাজার বছর আগে মানুষ আয়ত্ত করে আগুন আর চাকার ব্যবহার, নির্মাণ করে সুরক্ষিত আশ্রয় আর আবাস, শুরু করে পশুপালন আর কৃষি । কিন্তু সত্যিকার অর্থে প্রকৃতির নিয়মাবলি অনুধাবন করে তার ভিত্তিতে জীবনের রূপান্তর ঘটাবার কাজ —অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভব — একান্তই সাম্প্রতিককালের ঘটনা । বলা চলে মাত্র গত তিন-চারশ বছর ধরে বিজ্ঞানের বিপুল বিস্তার এবং তার সাহায্যে নতুন বিজ্ঞাননির্ভর প্রযুক্তি আয়ত্ত করে প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্যের অব্যাহত যাত্রা শুরু হয়েছে ।

কিন্তু প্রশ্ন হল আঠার বা উনিশ শতকে — এমন কি বিশ শতকের শুরুতেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের জীবনের নানা জটিল সমস্যার সমাধান দেবার যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেখা দিয়েছিল তা কি আজো বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়? বিজ্ঞান পৃথিবীতে অনেক ক্ষেত্রে অভাবিতপূর্ব সমৃদ্ধির সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তেমনি কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা নতুন নতুন সমস্যারও সৃষ্টি করছে না?

এক হিসেবে দেখলে এই অভিযোগ অনেকখানি পরিমাণে সত্যি বলেই মনে হবে। আর মাত্র অল্পদিনের মধ্যেই এগিয়ে আসছে একুশ শতকের পৃথিবী । এই একুশ শতকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কি নিয়ে আসছে মানুষের জন্য? — সে কি অনন্ত জটিলতার আবর্ত, না কি অফুরন্ত সম্ভাবনার দিগন্ত?

প্রত্যাশা ও বাস্তবতা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে এমন প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছিল যে, যুক্তি ও অনুসন্ধানের সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে বিশ্বের তাবৎ জ্ঞান মানুষের আয়ত্ত হতে পারে; বিশ্বের কোন কিছুই মানববুদ্ধির অগম্য নয় । তার চেয়েও বড় কথা হল শিল্প-বিপ্লবের মাধ্যমে বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির আশ্চর্য মেলবন্ধনের ফলে উনিশ শতকের শুরুতে উৎপাদন

ব্যবস্থায় এমন বিপুল বিকাশ ঘটতে আরম্ভ করে যে, মানুষ অদূর ভবিষ্যতে সমৃদ্ধি আর প্রাচুর্যের এক স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। অঢেল খাদ্য, প্রচুর খনিজ সম্পদ, অফুরন্ত জ্বালানিশক্তি, রসায়নের আশ্চর্য কৌশলে উৎপন্ন বিস্ময়কর গুণাগুণযুক্ত নানা বস্তু, যোগাযোগের নানা অভাবিতপূর্ব উপযোগ, রোগ-ব্যাধি-জরার ওপর আধিপত্য বিস্তারের ফলে অন্তহীন যৌবন — এসবই মানুষের অধিগম্য বলে বিশ্বাস জন্মাতে আরম্ভ করে।

এসব প্রত্যাশা যে একেবারেই অলীক ছিল তা অবশ্য বলা শক্ত। সত্যি সত্যি গত দু'তিনশ বছরে মানুষের সভ্যতার বিপুল বিকাশ ঘটেছে; পৃথিবীর জনসংখ্যার একটি বড় অংশ প্রাচুর্যের মুখ দেখেছে; তাদের জীবনমান এই বিশ শতকের শেষে আজ এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যা উনিশ শতকের মানুষের কাছেও ছিল কল্পনার অতীত। তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের যেসব মানুষ সভ্যতার বিশাল অভিযাত্রায় ব্রাত্যবর্গে স্থান পেয়েছে তারাও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসাদ থেকে যে একেবারে বঞ্চিত থেকেছে তা নয়; খানিক পরিমাণে হলেও তারাও পেয়েছে এর ভাগ। তাই জীবকুলের মধ্যে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব আর পরিবেশের নানা শক্তির ওপর আধিপত্যের জয়পতাকা উড়িয়ে বিপুল বিক্রমে অধিকার করতে আরম্ভ করেছে পৃথিবীর জল-স্থল-আকাশ।

প্রাণিপ্রজাতি হিসেবে মানুষের সাফল্যের সবচেয়ে বড় স্বাক্ষর হল তার প্রবল পরাক্রান্ত বংশ বিস্তার। মানুষের সংখ্যা শূন্যের কোঠা থেকে শুরু করে একশ কোটির অঙ্কে পৌঁছতে লেগেছিল বহু হাজার বছর। মাত্র উনিশ শতকের বিশের দশকে মানুষের সংখ্যা এই অঙ্কে পৌঁছায়। অথচ আজ প্রতি দশ-বার বছরে একশ কোটি করে মানুষ বাড়ছে। এই বিশ শতকের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা ১৬৫ কোটি থেকে বাড়তে বাড়তে দু'শ, তিনশ, চারশ আর পাঁচশ কোটির কোঠা ছাড়িয়ে আজ ছ'শ কোটির দিকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

বিশ শতকের মধ্যেই মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ৩৫ বছর থেকে বেড়ে আজ ৬৫ বছরের মতো হয়েছে। নগরবাসী লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র দশ শতাংশ থেকে বাড়তে বাড়তে পঞ্চাশ শতাংশের কাছাকাছি এসেছে। জীবাশ্ম জ্বালানি এবং অন্যান্য খনিজদ্রব্যের ব্যবহার বেড়েছে পনের থেকে বিশগুণ। শক্তির উৎপাদন বেড়েছে প্রায় চল্লিশগুণ।

কিন্তু মানুষের সভ্যতা তো এখানেই থেমে নেই। তারপরও পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। জন্মশাসনের বিপুল উদ্যোগ সত্ত্বেও জনসংখ্যা রুদ্ধশ্বাস হারে বাড়তে বাড়তে আগামী শতাব্দীর শেষদিকে এক সময় হাজার কোটির অঙ্ক ছোঁবে। এর মধ্যে মানুষের গড় আয়ু খুব সম্ভব আশি বছরে গিয়ে পৌঁছবে। জীবনের নানা দিকে বিজ্ঞানের আরো নানা বিস্ময়কর অগ্রগতির কল্যাণস্পর্শ মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য আরো বাড়িয়ে তুলবে। বস্তুবিজ্ঞান যেমন দেবে আশ্চর্য গুণাগুণযুক্ত নানা উপাদান, তেমনি কমপিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তির বিস্তার, জীব-প্রযুক্তির অগ্রগতি, মহাকাশে মানুষের অভিযাত্রা — এসব মানব প্রজাতির জীবনাচারে নিঃসন্দেহে নানা অভূতপূর্ব সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে।

কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ কি একুশ শতকেই মানুষের সব সমস্যার সমাধান দিতে পারবে? —খুব সম্ভব পারবে না। তবে এটুকু বলা চলে যে, বিশ শতকে আমাদের চারপাশে জ্ঞানের বিস্তার যে হারে ঘটেছে একুশ শতকে তা আরো দ্রুত হবে; এই শতকে আমাদের চারপাশের পরিবেশ যে হারে বদলেছে, সে পরিবর্তনের হার প্রায় নিশ্চিতভাবে আরো ত্বরান্বিত হবে; বিশ শতকে যদি আমাদের জীবনে নানা দিক দিয়ে জটিলতা বেড়ে থাকে, একুশ শতকে জীবন সম্ভবত আরো বেশি জটিলতায় আক্রান্ত হবে।

কিন্তু উনিশ শতকে উৎপাদন শক্তির বিপুল বিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ যে অভূতপূর্ব প্রাচুর্য আর স্বাচ্ছন্দ্যময় স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল সেখানে পৌঁছতে আর কত দেরি? একুশ শতক কি মানুষকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে?

জটিলতা বাড়ছে

সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হবে, সে স্বর্গরাজ্যে পৌঁছবার পথে দুস্তর বাধার বিন্ধ্যাচল আজো আমাদের সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির রুদ্ধশ্বাস গতির ফলে পৃথিবীর নানা বস্তুসম্পদ নিঃশেষ হয়ে আসার স্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। চাষের জমির পরিমাণ কমছে; বনজঙ্গল যে হারে নিধন করা হচ্ছে তাতে একুশ শতকের মধ্যে সারা পৃথিবী থেকে বন-বনানী চিরদিনের মতো হারিয়ে যেতে পারে। বলা বাহুল্য সেই সঙ্গে হারিয়ে যাবে পাখির কলকাকলি, বনের অসংখ্য জীবপ্রজাতি। অসংখ্য উদ্ভিদ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রজাতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শিল্পকারখানাগুলো নানা বিষাক্ত বস্তু আমাদের মাটিতে, হাওয়ায়, পানিতে ছড়িয়ে দিচ্ছে; তাতে এই বিলুপ্তির হার আগামী দিনে আরো বাড়বে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন একুশ শতকের মধ্যে প্রাণিপ্রজাতির প্রায় অর্ধেকই হারিয়ে যেতে পারে।

হাওয়ায় কারবন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি তাপশোষক গ্যাসের হার বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়তে আরম্ভ করেছে। সম্ভবত আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই গলতে শুরু করবে মেরু অঞ্চলের আর পর্বতশিখরের বিপুল বরফের স্তূপ, ফুলে উঠতে থাকবে উত্তাপে প্রসারিত সাগরের জলরাশি; সারা পৃথিবী জুড়ে দেখা দেবে খরা, ঝঞ্ঝা আর বন্যার প্রকোপ। সভ্যতার সুরম্য কাঠামোয় চারপাশে অজস্র স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ নিয়েও পৃথিবীর পরিবেশ তখন হয়ে উঠতে পারে একেবারেই মানুষ বাসের অযোগ্য।

বিজ্ঞানের আশ্চর্য অবদানের আশীর্বাদে পৃথিবী জুড়ে বাড়ছে খাদ্যশস্যের উৎপাদন; রসায়নের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে বস্তুসম্পদের বিপুল প্রাচুর্য। কিন্তু তবু কি ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের বিভীষিকা কমছে? পৃথিবীতে আজো প্রায় একশ কোটি মানুষ

নিরক্ষর; একশ কোটি বাস করছে দারিদ্রসীমার নিচে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, প্রায় দেড়শ কোটি মানুষের জন্য কোন স্বাস্থ্য-সুবিধের ব্যবস্থা নেই । সব মিলিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশীর্বাদপুষ্ট এই প্রাচুর্যময় পৃথিবীতে ক্ষুধা আর অসাম্যের বিস্তার কমছে একথা বলা আজো শক্ত ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর অধিকারের ক্ষেত্রে অসাম্য যে কমছে না, বরং বেড়েই চলেছে তা তো অতি স্পষ্ট । আজ পশ্চিমের দেশগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপুল বিকাশ দেখতে পাওয়া গেলেও এসত্য কেউই অস্বীকার করেন না যে, মানব সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল প্রাচ্যে — বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রথম পাঠ নিয়েছিল মানুষ সুমের, মিসর, চীন, ভারত এসব প্রাচ্যদেশের নানা উর্বর নদীমেখলা উপত্যকায় । সেই আদি বিজ্ঞানের বিকাশের ধারায় সুদীর্ঘকাল ধরে অবদান রেখেছে চীন, ভারত, আরব প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষেরা । নতুন বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অস্ত্রসজ্জা কাজে লাগিয়ে পাশ্চাত্য একদিন এসব অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, কিন্তু এসব অঞ্চলের মানুষরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে অবদান রাখতে অক্ষম এমন অপবাদ পাশ্চাত্য দেশের পন্ডিতরাও দিতে পারবেন না ।

অথচ আজ দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চর্চার মাধ্যমে সভ্যতার যে অমৃত মানুষের আয়ত্ত হয়েছে তার সিংহভাগ ভোগ করছে পাশ্চাত্য দেশের মানুষ, আর তাদের অতিলোভের ফলে যে গরল সঞ্চিত হচ্ছে তার প্রায় সবটা জুটছে প্রাচ্যের ভাগ্যহত মানুষদের কপালে । বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক বিষ, বাতিল হয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতি, ক্ষতিকর ওষুধপত্র, কীটনাশক, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য, সর্বনাশা নেশার বস্তু, মারাত্মক এড্স্ রোগ—এসবই চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে দরিদ্র, নিরক্ষর, অসচেতন তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের ওপর । পাশ্চাত্যের ভোগবাদী, অপচয়মূলক সভ্যতা যে বিপুল জ্বালানি ব্যবহার করছে তারই ফলে বায়ুমন্ডলে তাপশোষক গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে; অথচ এই প্রক্রিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব বেশিরভাগ গিয়ে পড়ছে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ, মিসর, চীন, ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া প্রভৃতি বদ্বীপবাসী উর্বর নিম্নাঞ্চলের মানুষদের ওপর ।

তার চেয়েও বড় আর আশু বিপদ সৃষ্টি করেছে পৃথিবী জুড়ে মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতা আর যুদ্ধের ধ্বংসলীলা । সারা পৃথিবীতে মানুষ যত সম্পদ উৎপাদন করে তার ছ'শতাংশ ব্যয় হচ্ছে যুদ্ধের আয়োজনে — অর্থাৎ মানুষ ও তার কীর্তিকে ধ্বংসের জন্য; অথচ শিক্ষা আর স্বাস্থ্যের খাত মিলিয়ে ব্যয় হচ্ছে তার অর্ধেকের কাছাকাছি মাত্র । শুধু ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে যে পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস হয়েছে তা বাঁচিয়ে কাজে লাগানো গেলে পৃথিবী থেকে ম্যালেরিয়া চিরদিনের জন্য উচ্ছেদ করা যেত, সারা পৃথিবীর মানুষের পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হত । পৃথিবীর এক বছরের সামরিক ব্যয়ের অঙ্ক দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের সব দেশকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি দেয়া যায়, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া যায় প্রতিটি নিরক্ষর মানুষের কাছে । এই অসাম্য আর ধ্বংসোন্মাদনা আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল সমস্যা। আর এই যুদ্ধের ধ্বংসোন্মত্ততা পৃথিবীর পরিবেশ যেভাবে কলুষিত করে তুলছে তা আগামী দিনে মানুষের সভ্যতার জন্য সমূহ বিপদ ডেকে আনতে পারে ।

বিজ্ঞানের নিজস্ব সমস্যা

চারপাশের পরিবেশে এবং সমাজে যেমন সমস্যা বেড়ে চলেছে তেমনি বিজ্ঞানের নিজস্ব এলাকাতেও সমস্যা কম নয়। বস্তুর অন্তর্লোকের রূপ এবং বিশ্বজগতের চিত্র — মৌলবিজ্ঞানের শুধু এই দু'টি প্রসঙ্গ নমুনা হিসেবে নেয়া যাক । বস্তুজগতের প্রকৃতি এবং মহাবিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের চেষ্টা মানুষের চিরকালের অন্বিষ্ট । কিন্তু সে জ্ঞানের শেষ প্রান্তের কাছাকাছি কি মানুষ আজো পৌঁছতে পেরেছে?

প্রাচীনকালের গ্রীক দার্শনিকরা বলেছিলেন বিশ্বের বস্তুসত্তা হাওয়া, পানি, মাটি আর আগুন এই চারটি মৌল উপাদানে তৈরি—সে যুগ আমরা বহুকাল আগে পেরিয়ে এসেছি । অণু আর পরমাণুভিত্তিক বস্তুপ্রকৃতির ধারণাও আজ পুরনো । উনিশ আর বিশ শতকের সন্ধিকালে মানুষ পরমাণুর মৌলকণা ধনাত্মক প্রোটন আর ঋণাত্মক ইলেকট্রনের হদিস পায় ; এই দুই-এর বৈদ্যুতিক আধান সমান হলেও প্রোটনের ভর ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় দু'হাজার গুণ বেশি । তারপর তিরিশের দশকে মানুষ জানল বিদ্যুৎবিহীন কণা নিউট্রনের অস্তিত্ব । সে সময়ে মনে হয়েছিল সৌরজগতের মতো ঘূর্ণ্যমান পরমাণুর চিত্র এক চমৎকার যুক্তিসংগত কাঠামোর জন্ম দিয়েছে । ইলেকট্রনের-কণা আর তরঙ্গ-চরিত্রের দ্বৈতরূপ এই ছবিতে আনল কিছু জটিলতা; তবে তা সত্ত্বেও ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন সমন্বয়ে পরমাণুর ধারণা বস্তুর নানা ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণের উপলব্ধি ও প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণে আশ্চর্য সাফল্য এনে দিল ।

কিন্তু তারপরও বস্তুর চরিত্রচিত্রণে সমস্যা কমল না, বরং বাড়তেই থাকল । পরমাণু-কেন্দ্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মানুষ তাতে সঞ্চিত বিপুল শক্তিরই শুধু সন্ধান পেল না, অসংখ্য নতুন মৌলকণারও হদিস পাওয়া গেল । নানা জাতের মেসন, নানা জাতের নিউট্রিনো প্রভৃতি অসংখ্য কণার সমাহারে মৌলকণার তালিকা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল । ষাটের দশকে এমনি 'মৌলকণা'র সংখ্যা দাঁড়াল আশির ওপরে।

এযুগের বিজ্ঞানের একটি মূল সুর হল প্রকৃতির নানা জটিল সূত্রের মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক এবং সবচেয়ে সরল সম্পর্কসূত্রের সন্ধান । এই সম্পর্কসূত্র খুঁজতে খুঁজতেই অবশেষে বিজ্ঞানীরা হদিস পেলেন কোয়ার্ক নামে কণিকার । এই কোয়ার্ক কণিকা দেখা যায় না, হয়তো কখনো দেখা যাবেও না; কিন্তু মাত্র ছ'টি কোয়ার্ক কণিকা দিয়ে ব্যাখ্যা করা গেল পরমাণু কেন্দ্রের প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি ইতোপূর্বে 'মৌলিক' বলে চিহ্নিত সব কণার চরিত্র । তেমনি পরমাণুকেন্দ্রের বাইরের ইলেকট্রন, নিউট্রিনো প্রভৃতি অসংখ্য কণিকার মৌল উপাদান ধরা হল লেপটন নামে ছ'টি কণিকা ।

এই সরলীকরণের সাম্প্রতিক একটি সাফল্য হল বিশ্বের মূল যে চারটি শক্তি অর্থাৎ মহাকর্ষ, প্রবল মিথস্ক্রিয়া, মৃদু মিথস্ক্রিয়া ও বিদ্যুৎচৌম্বকত্ব — গ্লাসহাও, ভাইনবার্গ ও সালামত্রয়ী তার মধ্যে শেষ দু'টির অভিন্নতা প্রতিপন্ন করেছেন । এদের সঙ্গে মহাকর্ষ ও প্রবল মিথস্ক্রিয়াকে একীভূত করা আজো সম্ভব হয়ে ওঠে নি । আপেক্ষিক তত্ত্বের মাধ্যমে বস্তু আর শক্তিকে একীভূত করার পর সব ধরনের শক্তির জন্য এমনি এক একীভূত তত্ত্বের স্বপ্ন একদিন আইনস্টাইন দেখেছিলেন— কিন্তু সেই চূড়ান্ত সরলীকরণের দিকে তিনি তেমন এগোতে পারেন নি ।

নানা অতিমৌলিক কণিকার সন্ধানে বিজ্ঞানীরা আজ বিপুল শক্তিধর ত্বরকযন্ত্র ব্যবহার করে পরমাণু কণাকে ভাঙ্গার পরীক্ষা করছেন । বহুলক্ষ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তিতে পরমাণু কণার সংঘাত থেকে জন্ম নেয় নানা বিচিত্র অতিমৌলিক কণিকা। তাদের নিমেষকালের অস্তিত্ব ছাপ ফেলে অতিসুবেদী যন্ত্রের আলোকচিত্রে । এমনি ধারার পরীক্ষা থেকে গ্লাসহাও-সালাম-ভাইনবার্গ তত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে পরীক্ষাগারে সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে 'ডব্লিউ' ও 'জেড' নামে দু'টি কণিকার অস্তিত্ব ।

পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে কাজ করে যে প্রবল মিথস্ক্রিয়া তার কারণ হিসেবে জাপানী বিজ্ঞানী ইউকাওয়া কল্পনা করেছিলেন তাদের মধ্যে পাই-মেসন নামে এক রহস্যময় কণিকার বিনিময় । আজ প্রোটন, নিউট্রন, পাই-মেসনের গভীরে যে ছ'রকম কোয়ার্ক কণার অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছে তাদের আবার আছে তিন রকম 'রঙ' — দু'টি লাল, দু'টি সবুজ ও দু'টি নীল । অবশ্য এ রঙ আমাদের প্রচলিত অর্থের রঙ নয়, বিজ্ঞানীদের গণিতের হিসেবের বিশেষ চরিত্র । এমনি তিন রকম রঙ আছে ছ'টি লেপটন কণারও ।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, যদি আরো শক্তিশালী ত্বরকযন্ত্র সৃষ্টি করা যায় তাহলে মৌলিক কণার আরো গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব হবে । আর সেই বিপুল শক্তিপ্রবাহের মধ্যে মৃদু মিথস্ক্রিয়া আর বিদ্যুৎচৌম্বকত্বের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে অন্য দু'টি মৌল শক্তি— মহাকর্ষ আর পরমাণুকেন্দ্রের প্রবল মিথস্ক্রিয়া । কিন্তু কতদিনে তেমন শক্তিশালী ত্বরকযন্ত্র আবিষ্কৃত হবে? বস্তুর গভীর গোপন রূপ কি কখনো পুরোপুরি জানা যাবে? কখনো কি সেই পূর্ণাঙ্গ একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের অন্বিষ্ট মানুষের আয়ত্ত হবে? — আজ এসব প্রশ্নের জবাব কেউই দিতে পারবে না ।

এমনি জটিলতা রয়েছে মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব আর স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা নিয়েও। আসলে মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব বস্তুকণার আদিরূপের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কবিহীন নয় ।

এই শতকের বিশের দশকে এডউইন হাব্‌ল নামে একজন মার্কিন জ্যোতির্বিদ নক্ষত্রলোকের আলোক বর্ণালি পরীক্ষা থেকে এক আশ্চর্য সিদ্ধান্তে পৌঁছান। সে হল মহাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী যেন নিরন্তর পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে; আর যে নক্ষত্রপুঞ্জ যত বেশি দূরে তার এই অপসারণের বেগ যেন তত বেশি । সেই থেকে সূত্রপাত ঘটে বিস্ফারমান মহাবিশ্বের তত্ত্বের । মহাকাশ বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার তথ্যের সঙ্গে খাপ খায় এই তত্ত্ব; আর তাই বিজ্ঞানিসমাজের মধ্যে এ তত্ত্ব নিয়ে আজ আর তেমন দ্বিমত নেই ।

বিস্ফারমান বিশ্বের তত্ত্ব অনুসারে বিশ্বের সব বস্তুপুঞ্জ যখন কেবলই পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই সুদূর অতীতে কোন এক ক্ষুদ্র কেন্দ্র থেকে বস্তুপুঞ্জের এই দীর্ঘ অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল । এক বিপুল বিস্ফোরণে কোন অতিক্ষুদ্র আদিকণা থেকে বস্তুপুঞ্জ ছিটকে বেরোতে থাকে সম্ভবত দেড়হাজার কোটি বছর আগে এক বিশেষ মুহূর্তে । এই তত্ত্ব বলছে বিশ্ব সৃষ্টির এক সেকেন্ডের কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি (অর্থাৎ একের পিঠে ৩৫টি শূন্য) ভাগের পর বিশ্বের তেজসমাহার কমে দাঁড়ায় একশ কোটি কোটি কোটি (একের পিঠে ২৩টি শূন্য) ইলেকট্রন ভোল্ট; তখন সেই আদি বস্তুকণা থেকে কোয়ার্ক আর লেপটন কণাগুলি পৃথক সত্তা পেতে শুরু করে । তারপর সেই আদি মুহূর্তের লক্ষ ভাগের এক সেকেন্ড পর এসব কোয়ার্ক কণা থেকে প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতির উদ্ভব ঘটে । তারও প্রায় এক মিনিট পর সে সব কণিকা থেকে হিলিয়াম, লিথিয়াম প্রভৃতি সরল পরমাণু সৃষ্টি হয় ।

কিন্তু তারপর বিশ্বলোকে যা ঘটেছে তার আদি-অন্ত নির্ণয় করতে বিজ্ঞানীরা হিমশিম খাচ্ছেন । এই মহাবিশ্ব দেড়হাজার কোটি বছর ধরে বিস্ফারিত হতে হতে আজ প্রায় হাজার কোটি গ্যালাক্সির উদ্ভব ঘটেছে — তার কোন কোনটিতে আমাদের গ্যালাক্সির মতো দশ হাজার কোটি নক্ষত্র রয়েছে । আমাদের গ্যালাক্সির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আলো পৌঁছতে প্রায় এক লক্ষ বছর পেরিয়ে যায় । পৃথিবীর বুকে অতি শক্তিশালী দূরবীন বসিয়ে বিজ্ঞানীরা দু'শ কোটি আলোক-বছর দূরের নক্ষত্রলোকের আলো ধরতে পেরেছেন । ১৯৯০ সালে দেড়হাজার কোটি ডলার ব্যয়ে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহের বুকে হাব্‌ল টেলিস্কোপ বসানো হয়েছে; তার সাহায্যে ১৪০০ কোটি আলোক-বছর দূরের নক্ষত্রের আলো ধরতে পারার কথা ছিল; কিন্তু দূরবীনটি ঠিকমতো কাজ না করায় তা সম্ভব হয় নি ।

অতি দূরের নক্ষত্রলোক সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় মহাবিশ্ব সত্যি সত্যি কত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা আজো পুরোপুরি নিশ্চিত নন । তার ওপর বড় কথা হল এই বিস্তার কি অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে, নাকি মহাবিশ্বের নানা বস্তুর মহাকর্ষের টানে ক্রমে ক্রমে এর বেগ স্তিমিত হয়ে আসবে? অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা একদিন বিস্তারের বেগ কমতে কমতে আবার মহাবিশ্বের সংকোচন শুরু হবে এবং সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো আর এক প্রলয়ংকর বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে নতুন আরেক মহাবিশ্বের জন্ম হবে । কিন্তু মহাবিশ্বে যতটা বস্তুর পুঁজি থাকলে এই সংকোচন সম্ভব হতে পারে তার মাত্র এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ এযাবৎ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে । বিজ্ঞানীরা বলছেন, মহাকাশে বিপুল পরিমাণ বস্তু আছে আলোহীন অন্ধকারে; তাদের পুরো ভর জানা গেলে বোঝা যেত মহাবিশ্ব কি অনন্তকাল ধরে প্রসারিত হতে হতে অবশেষে শীতল

মৃত্যুবরণ করবে, নাকি আবার প্রবল বেগে সংকুচিত হয়ে বিপুল বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে আরেক মহাবিশ্বের নবজন্ম ঘটবে । এ জটিলতার মীমাংসা কি একুশ শতকের বিজ্ঞান দিতে পারবে?

প্রয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতা

মৌল বিজ্ঞানের তত্ত্বেই যে কেবল গভীর জটিলতা রয়েছে তা নয়, বিজ্ঞানের প্রয়োগে আজ যে নানা আশ্চর্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে সেখানেও জটিলতার পরিমাণ কম নয় । প্রযুক্তিক্ষেত্র থেকে এ ধরনের দু'টি নমুনা নেয়া যাক : সেগুলো হল জীবপ্রযুক্তি ও মহাকাশে অভিযাত্রা ।

উনিশ শতকের ষাটের দশকে অস্ট্রীয় পাদ্রী গ্রেগর ইওহান মেন্ডেল নানা জাতের মটরশুঁটির সংকর ঘটাতে গিয়ে বংশগতির কতকগুলো মৌলিক নীতি আবিষ্কার করেন। উদ্ভিদবিদ্যার ক্ষেত্রে সংখ্যাগণিতের ব্যবহার সেকালে প্রচলিত না থাকায় এসব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার তাৎক্ষণিক কোন সাড়া জাগাতে পারে নি; এ আবিষ্কারের গুরুত্ব বোঝা যায় অবশেষে বিশ শতকের শুরুতে । এসব আবিষ্কার ব্যবহার করে উদ্ভিদ ও প্রাণিপ্রজাতিতে রূপান্তর সাধনের নানা পদ্ধতি বিজ্ঞানীরা আয়ত্ত করেন । বিশেষ করে কৃষি ও পশুপালনের ক্ষেত্রে তার ফলে বেশ বড় রকম অর্থনৈতিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ।

বিজ্ঞানীরা দেখেন প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবকোষের কেন্দ্রে রয়েছে জোড়ায় জোড়ায় ক্রোমোজোম তন্তু; এই ক্রোমোজোমের গায়ে ডি.এন.এ. (ডিঅক্সি-রাইবো-নিউক্লেয়িক অ্যাসিড) নামে জটিল রাসায়নিক অণুর খন্ড খন্ড অংশে লুকানো আছে জিন নামে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক গুণাগুণযুক্ত কণা । আর এই জিনকণার গায়েই অণু-বিন্যাসের ভাষায় লেখা জীবদেহের সব গুণাগুণের সংকেত । এসব সংকেত কখনো থাকে সুপ্ত, কখনো হয় ব্যক্ত — আর এই সংকেতবিন্যাসই জীবদেহের সব রকম চারিত্রের জন্য দায়ী ।

১৯৫৩ সালে ফ্রান্সিস ক্রিক ও জেমস ওয়াটসন নামে দু'জন জীবরসায়নবিদ (প্রথম জন ব্রিটিশ, দ্বিতীয় জন মার্কিন) অন্যান্য পদার্থবিদ ও রসায়নবিদ সহকর্মীদের সহায়তায় ডি.এন.এ.-র পেঁচানো যুগল শৃঙ্খল আকৃতির গড়ন আবিষ্কার করলেন । সেই থেকে আণবিক জীববিজ্ঞান এবং বংশগতিবিদ্যার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটল । বিজ্ঞানীরা ক্রমে ক্রমে নানা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জিনসমাবেশের তথ্য আহরণ করলেন । সত্তরের দশকে উদ্ভাবিত হল বিশেষ বিশেষ এনজাইম বা উৎসেচক প্রয়োগে জীবকোষের নির্দিষ্ট জিনকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে অন্য জীবকোষে প্রতিস্থাপন করার কৌশল । তার ফলে সম্ভব হল জীবদেহের বংশগতির ধারাকে প্রভাবিত করে তাতে ইচ্ছেমতো গুণাগুণ সঞ্চার । যে প্রক্রিয়া এতদিন কৃষিবিদ ও পশুপালকরা প্রয়োগ করছিলেন সংকরায়ণের মাধ্যমে অনেকটা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে, তাতে বিজ্ঞানের গভীর জ্ঞানের জাদুস্পর্শ নতুন শক্তি সঞ্চার করল ।

উৎপাদন ব্যবস্থা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এই নতুন জীবপ্রযুক্তি ও জিন-প্রকৌশল আজ যুগান্তর আনছে। মানবদেহের ইনসুলিন সৃষ্টির জিন প্রতিস্থাপিত হয়েছে এসেরিশিয়া কোলাই নামে জীবাণুর দেহে আর তাকে দিয়ে সৃষ্টি করা যাচ্ছে অঢেল মানব-ইনসুলিন । আরো নানা নতুন গুণাগুণযুক্ত ওষুধ এবং বস্তু উৎপাদনে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারিত হচ্ছে । বিজ্ঞানীরা এযাবৎ প্রায় চার হাজার রকমের বংশগত রোগের কথা জেনেছেন । এসব রোগের কারণ যে সব জিন তাদের আজ চিহ্নিত করা হচ্ছে ।

সাম্প্রতিককালে বিপুল আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছে মানবদেহের সমগ্র জিনসমাবেশের মানচিত্র তৈরির প্রকল্প নিয়ে । উদ্ভিদ ও নিম্নস্তরের প্রাণিদেহের তুলনায় মানবদেহের জিনসমাবেশ অকল্পনীয়রূপে জটিল । এসেরিশিয়া কোলাই জীবাণুতে আছে মাত্র ৪০০০ জিনখন্ড, অথচ মানুষের প্রতিটি দেহকোষের ৪৬টি ক্রোমোজোমে আছে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ জিন । এসব জিনের পেঁচানো শৃঙ্খলে লুকানো রয়েছে প্রায় তিনশ কোটি ক্ষারকজোটের রাসায়নিক সংকেত । জেমস্ ওয়াটসনের নেতৃত্বে ১৯৯০ সালে মানুষের জিন-মানচিত্র নির্মাণের এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে । প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে তিনশ কোটি ডলার । আশা করা যাচ্ছে একুশ শতকের শুরুতে মানুষের দেহের প্রতিটি জিনের চরিত্র ও অবস্থান জেনে সেসব তথ্য গ্রন্থাগারের মতো কম্পিউটারের স্মৃতিভান্ডারে সংরক্ষণ করা যাবে । তার ফলে কোন ব্যক্তির যে কোন রকম জিনগত ত্রুটি শনাক্ত করা অতি সহজেই সম্ভব হবে এবং সে সম্পর্কে প্রতিকারের ব্যবস্থাও নেয়া চলবে ।

জীবদেহের জিনসমাবেশ ও তার নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান মানুষের হাতে বিপুল শক্তি এনে দিয়েছে । কিন্তু সেই সঙ্গে এক বিশাল নতুন দায়িত্ববোধ এবং আশঙ্কারও সৃষ্টি হয়েছে । নৈতিকতার দিক থেকে একজনের ব্যক্তিগত জীবনের সব তথ্য অন্যের জানার অধিকার কতখানি? জীবদেহের ধারাকে কতটুকু পর্যন্ত পরিবর্তন নীতিসম্মত? এসব পরিবর্তনের ফলে জীবজগতের ভারসাম্যে যে অভিঘাত পড়বে, পরিবেশের ওপর তার প্রতিক্রিয়া কি হবে? এই নতুন জ্ঞান কাজে লাগিয়ে যদি কেউ মানুষের বংশগত গুণাগুণ তার খুশিমতো বদলে দিতে চেষ্টা করে বা কোন ভয়ঙ্কর জৈব মারণাস্ত্র নির্মাণ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কোন সুযোগ থাকবে কি? — এসব প্রশ্নের জবাব আগামী শতকের মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে ।

এমনি ব্যবহারিক প্রয়োগের ও নৈতিকতার সমস্যা দেখা দিয়েছে মহাকাশ বিজয়ের অগ্রগতি নিয়েও ।

১৯৫৭ সালের ০৪ অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম স্পুতনিক উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে মহাকাশ অভিযাত্রার সূচনা হয়েছিল । তারপর দেখতে দেখতে দু'দশকের মধ্যে মানুষ মহাকাশে উঠেছে, নভোযান থেকে বেরিয়ে মহাশূন্যে বিচরণ করেছে, মহাকাশে স্থাপন করেছে স্বয়ংনির্ভর নভোগবেষণাগার। শুধু তাই নয়, মানুষ চাঁদের

বুকে গিয়ে নেমেছে বারবার, সেখান থেকে তুলে নিয়ে এনেছে মহাকাশের ধুলোমাটি-পাথর, মানবহীন স্বয়ংক্রিয় নভোযান নেমেছে পৃথিবী থেকে বহু কোটি কিলোমিটার দূরে শীতল মঙ্গল গ্রহে ।

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে নভোচারণবিদ্যার জনক কনস্তান্তিন ৎসিওল্কভ্স্কি বলেছিলেন, "পৃথিবী হল মানব সভ্যতার আঁতুড়ঘর; কিন্তু আঁতুড়ঘরে কেউ কি চিরকাল আবদ্ধ থাকতে পারে?" পৃথিবীর মানুষ আজ চাঁদে এবং অন্যান্য গ্রহে-উপগ্রহে আস্তানা গাড়বার পরিকল্পনা করছে । হয়তো একদিন দূর নভোলোকে আর কোন নক্ষত্রলোকে আবিষ্কৃত হবে আর কোন সভ্যতা; তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটবে মানুষের । পৃথিবী এবং সৌরজগৎ ছাড়িয়ে দীর্ঘকালীন মহাকাশযানে চেপে মানুষ যাত্রা করবে দূরের নক্ষত্রলোকের দিকে ।

কিন্তু দূরের নক্ষত্রলোকে যাওয়া দূরের কথা, চাঁদে স্থায়ী আস্তানা পাতা আর মঙ্গল গ্রহে মানুষ নামানোর পরিকল্পনাই আজ গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন । এতে প্রধান বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছে মহাকাশের বিরূপ প্রতিবেশে মানুষের দীর্ঘকালীন অবস্থানের শারীরতাত্ত্বিক সমস্যা এবং এধরনের প্রকল্পের বিপুল ব্যয় । ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত অ্যাপলো কর্মসূচিতে ছ'বারে বারজন নভোচর গিয়ে নেমেছিল চাঁদে; প্রতিবারেই মাত্র কয়েক ঘন্টা ধরে সেখানে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারা ফিরে আসে । এই অ্যাপলো প্রকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় হয়েছিল ২৫ বিলিয়ন (২৫০০ কোটি) ডলার ।

চাঁদের বাইরে সৌরজগতের আর কোথাও যেতে হলে মঙ্গলই হবে সবচেয়ে উপযুক্ত । একে মঙ্গল পৃথিবীর সবচাইতে কাছের গ্রহ, তার ওপর পৃথিবীর চেয়ে অনেক শীতল হলেও সৌরজগতের গ্রহদের মধ্যে মঙ্গলের তাপমাত্রাই পৃথিবীর সবচাইতে কাছাকাছি । শুক্র এত গরম যে, তাতে সীসে গলে যাবার কথা; তার ওপর শুক্রের বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর ওপরকার চেয়ে প্রায় একশগুণ বেশি । বুধের উত্তপ্ত দেহ চাঁদের মতোই বায়ুশূন্য; তার গায়ে সূর্যের মারাত্মক বিকিরণ পড়ে চাঁদের তুলনায় দশগুণ বেশি । বৃহস্পতি মূলত তৈরি হালকা গ্যাসে, তার বিশাল বপুর কারণে সেখানে মাধ্যাকর্ষণের টান প্রচণ্ড; আর তার চারদিকে রয়েছে মারাত্মক রশ্মিবলয় । মঙ্গল গ্রহের ওপরকার তাপমাত্রা শুধু যে মানুষের জন্য সহনীয় হতে পারে তা নয়, সেখানকার মাটি থেকে সম্ভবত জীবন ধারনের জন্য অকসিজেন আর পানি সংগ্রহ করা যাবে । মঙ্গল গ্রহে মানুষ বাসের সম্ভাবনা পরীক্ষা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দু'দেশই একুশ শতকের শুরুতে সেখানে অভিযাত্রীদল পাঠাবার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে । বলা হচ্ছে এ ধরনের অভিযানের জন্য প্রস্তুতি দরকার প্রায় দু'দশকের আর ব্যয়ের অঙ্ক দাঁড়াবে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি ।

কিন্তু প্রশ্ন হলঃ কোন একটি দেশের পক্ষে মঙ্গল গ্রহে অভিযাত্রার এই ব্যয়ের ঝুঁকি নেয়া কি সম্ভব? সোভিয়েত ইউনিয়ন এজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশকে এই প্রকল্প যুক্তভাবে আয়োজন করার জন্য আহবান জানিয়েছে । এমনি যুক্ত উদ্যোগ ব্যয়ের দিক দিয়ে অধিকতর সহনীয় এবং কারিগরি দিক দিয়েও অধিকতর সুবিধেজনক হবে। কিন্তু তবু প্রশ্ন জাগেঃ পৃথিবীর ওপরই যেখানে এত দারিদ্র, অশিক্ষা, ক্ষুধা আর অস্বাস্থ্যের সমস্যা অর্থের অভাবে দূর করা যাচ্ছে না, তখন মহাকাশে এ ধরনের অভিযান কি একান্তই জরুরি?

দূর নক্ষত্রলোকে যাত্রার সমস্যা নিঃসন্দেহে আরো বেশি জটিল হবে । যদি মহাকাশে কোথাও বাসের উপযোগী গ্রহলোকের সন্ধান পাওয়া যায় তবু সেখানে পৌঁছতে লেগে যাবে বহু লক্ষ বছর । নভোযানে মানুষের অস্তিত্ব ততদিন টিকিয়ে রাখার মতো প্রযুক্তি একুশ শতকের মধ্যে উদ্ভাবিত হবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত ।

তবু বিজ্ঞান-প্রযুক্তিই ভরসা

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে মনে হতে পারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের যেমন নানা সমস্যার সমাধান করেছে, তার জীবনে এনেছে প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য, তেমনি আবার পৃথিবীতে নানা নতুন নতুন সমস্যারও জন্ম দিয়েছে । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা কুপ্রভাব আজ আমাদের পরিবেশে ও সমাজে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে তাতে পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশের সমাজে এক ধরনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিরোধী মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে; এই পৃথিবীর নানা জটিলতা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে কোথাও কোথাও আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ।

বলা বাহুল্য এধরনের প্রশ্ন নতুন নয়, বরং এ এক অতি পুরনো সমস্যা । আগুনের ব্যবহার মানুষের জন্য প্রয়োজন । কিন্তু সে আগুনের অসাবধান ব্যবহার ঘর পোড়াতে পারে । কখনো কারো ঘর জ্বালিয়েছে বলে আগুনকে বর্জন করতে হবে এমন চিন্তাকে সুস্থ বা যুক্তিসঙ্গত চিন্তা বলে বিবেচনা করা শক্ত ।

সন্দেহ নেই যে, আজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দিচ্ছে তা ওপরের এ দৃষ্টান্তের চেয়ে অনেক বেশি জটিল । তবু এও তো সত্য যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে আজ যে অসাম্য পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে এবং এদের অপপ্রয়োগ যেসব সমস্যার জন্ম দিয়েছে তার জন্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই । বরং বলা চলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি যে আজ সভ্যতার অগ্রযাত্রায় এমন পিছিয়ে পড়েছে তার মূল কারণ হল তাদের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা । বাংলাদেশের কথা ধরলেও দেখা যাবে আজ যখন সারা পৃথিবীতে শিক্ষার ও জ্ঞানের বিপুল বিস্তার ঘটছে তখন এদেশে এখনো প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে যথাযথ বয়ঃক্রমের মাত্র তিনজনে দু'জন, মাধ্যমিক শিক্ষায় মাত্র চারজনে একজন এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই হার মাত্র বিশজনে একজন । মাধ্যমিক স্তরেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ভিত পাতা হয় । অধিকাংশ উন্নত দেশে মাধ্যমিক স্তরে প্রতিটি শিক্ষার্থী বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ

পায়, অথচ বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরের শেষ পর্যায়ে প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ থেকে আজো বঞ্চিত ।

বিজ্ঞানের নিজস্ব ক্ষেত্রে যেসব অন্তর্নিহিত সমস্যা দেখা দিয়েছে তারও সমাধান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আরো গভীর চর্চার মধ্যেই নিহিত । বিজ্ঞান প্রকৃতির সব রহস্যের সন্ধান এখনও দিতে পারে নি, একথা সত্যি । কিন্তু গত দু'তিনশ বছরে যেসব রহস্যের গ্রন্থিজাল উন্মোচিত হয়েছে তা মানুষের চেতনাকে বহুগুণে প্রসারিত করেছে; এসব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের প্রয়োগ মানুষের সামনে এক নতুন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে।

বিশ শতকে বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের সামনে নতুন জ্ঞানের আলোক দীপ্ত হয়েছে, মহাকাশের সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত মানুষের সন্ধানের বিস্তৃতি ঘটেছে, প্রাণলোকের গভীর গোপন রহস্য আজ মানুষের জন্য অবারিত । পরমাণুশক্তি, লেজার, কমপিউটার, নভোযান, শস্যের ফলন বৃদ্ধির নানা কৌশল, জীবপ্রযুক্তি, নতুন নতুন গুণাগুণযুক্ত কৃত্রিম বস্তু, সৌরকোষ প্রভৃতি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, তথ্য-প্রযুক্তি, ব্যাধি ও জরার বিরুদ্ধে সাফল্য —এ সবই মানুষকে নতুন বলে বলীয়ান করে তুলেছে । একুশ শতকে মানুষ জ্ঞানের এবং সে জ্ঞানের প্রয়োগের অভিযাত্রায় যে আরো বিশাল নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই ।

এই বিশ শতকের অগ্রগতির অভিজ্ঞতা থেকে আগামী একুশ শতকের জন্য কয়েকটি সিদ্ধান্তে এখানে পৌঁছানো যেতে পারেঃ

১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অব্যাহত বিকাশ ছাড়া আজকের পৃথিবীতে মানুষের যেসব সমস্যা রয়েছে তার হাত থেকে মুক্তির কোন পথ নেই । এজন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার খাতে ব্যয় বরাদ্দ যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে বাড়ানো জরুরি প্রয়োজন । উন্নয়নশীল দেশগুলিই এদিক দিয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে ।

২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এতকাল বিবেচনা করা হত মূলত পৃথক পৃথকভাবে; কিন্তু আজ তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, এদেরকে শিক্ষাব্যবস্থায় এবং অন্যত্র সমন্বিতভাবে বিবেচনা না করে উপায় নেই । আজকের অধিকাংশ নতুন প্রযুক্তিই বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি; কাজেই মৌলবিজ্ঞানের গবেষণা ছাড়া এসব প্রযুক্তি আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য ।

৩. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বিকাশের যে অসাম্য সৃষ্টি হয়েছে তার নিরসনের ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে নিতে হবে। পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ মানুষের হাতে আজ বিশ্ব অর্থনীতির এবং শক্তি সম্পদের আশি শতাংশ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে । সারা পৃথিবীতে এই বিপুল বৈষম্য বজায় রেখে পরিবেশের আসন্ন বিপর্যয় রোধ করা যাবে না । এমনি একপেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এক ভারসাম্যহীন বিশ্বপরিস্থিতির জন্ম দিচ্ছে ।

৪. আজকের পৃথিবীতে যেসব জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে—যেমন পৃথিবীর তাপবৃদ্ধি, ওজোন স্তরের হ্রাস, এড্স্ রোগ, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস — এসবের সমাধানের জন্য পৃথিবীর দেশে দেশে সহযোগিতা আরো সুদৃঢ় করা প্রয়োজন । কোন দেশেরই একক প্রচেষ্টায় এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আলো-হাওয়া-পানির মতো সারা পৃথিবীর মানুষের সাধারণ উত্তরাধিকার; কোন দেশই এগুলোর ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব দাবি করতে পারে না ।

৫. বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও পরিবেশের ভারসাম্যের সংকট আজ মানুষের জীবনাচরণের নতুন নীতিমালা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে । এই নীতিমালার মধ্যে থাকবে ঃ বস্তু ও শক্তি ব্যবহারে অপচয় রোধ; পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকে সকল উন্নয়ন বিবেচনায় স্থান দেয়া; উৎপাদন ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় সকল মানুষের কল্যাণ চিন্তার প্রাধান্য। উন্নয়ন পরিকল্পনায় গণমানুষের কল্যাণ ও প্রকৃতির ভারসাম্য বিবেচনা না করলে প্রকৃতি তার নির্মম প্রতিশোধ নেবে ।

৬. যুদ্ধের উন্মাদনা বন্ধ করে শান্তিকালীন পুনর্গঠনের পথে পৃথিবীর সব সম্পদ নিয়োগ করতে হবে। এই পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করা না হলে সমগ্র মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয় ।

৭. সমরসজ্জার পরিবর্তে জনসম্পদ সৃষ্টির ওপর বেশি করে গুরুত্ব দিতে হবে । জনসম্পদের বিকাশই শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও তার সর্বোত্তম প্রয়োগের চাবিকাঠি ।

আজ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সমস্যা যত জটিলই মনে হোক, তার সমাধান অসাধ্য নয়। অতীতে মানুষ চিরকাল সংকটকালে নতুন নতুন উদ্ভাবনশীলতার পরিচয় দিয়েছে । সতের শতকের শুরুতে ইংলন্ডে বনজঙ্গল কমে গিয়ে যখন জ্বালানি কাঠের সমস্যা দেখা দেয় তখন খনিজ কয়লার ব্যবহার শুরু হয়। আবার উনিশ শতকের মাঝামাঝি যখন শিল্পবিস্তারের ফলে কয়লার সংকট দেখা যায় তখন খনিজ তেলের ব্যবহার উদ্ভাবিত হয়। আগামীতেও মানুষের নিত্য নব উদ্ভাবনশীলতা এভাবেই সভ্যতার সংকট নিরসনে অবদান রাখবে।

একুশ শতকের বিজ্ঞানের বিশেষ কিছু চরিত্র আমাদের আরো বেশি করে আশান্বিত করে তোলে । এই বিজ্ঞান মানুষের সামনে প্রকৃতির বিপুল রহস্যকে অবারিত করেছে; বিশ্বচরাচরে বিস্তৃত সমস্ত জ্ঞানকে করেছে সারা পৃথিবীর মানুষের সাধারণ সম্পত্তি। এককালে জীবজগতের প্রধান শক্তির উৎস ছিল পেশীর শক্তি, খনিজ আর জ্বালানি । আজ ক্রমেই মানুষের প্রধান শক্তি হয়ে উঠছে তার মেধা। একুশ শতক হবে মূলত মানুষের মেধা বিকাশের শতাব্দী। আজকের দিনে তথ্য-প্রযুক্তির বিপুল বিস্তারের ফলে স্বৈরাচার টিকিয়ে রাখা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে । তথ্য ও জ্ঞানের বিস্তার যত বেশি ঘটবে, গণতন্ত্র ও সাম্যের ধারাও পৃথিবীতে তত শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

একুশ শতক এসে পৌঁছতে আর তেমন দেরি নেই । এক উদার বিস্তৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক এই নতুন শতাব্দীতে দৃপ্ত পায়ে প্রবেশ করবে এ আমাদের সবার প্রত্যাশা ।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়ন

আজকের এই পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্রমেই মানুষের জীবনে বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিজ্ঞানের জ্ঞান অণু-পরমাণুর জগৎ থেকে শুরু করে বহু দূরের নক্ষত্রলোকের খবর মানুষের কাছে সত্য করে তুলেছে; এমন কি প্রাণলোকের গভীর রহস্যও আজ মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সেই সঙ্গে এসব জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নানা নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের জীবনে এসেছে বিপুল স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাচুর্য আর সমৃদ্ধি। এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কোন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির প্রধান চাবিকাঠি। বিশেষ করে যেসব উন্নয়নশীল দেশ শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে আছে তাদের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা আজ বিরাট তাৎপর্য বহন করে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৪৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর যখন ইউনেস্কো অর্থাৎ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার সংবিধান গৃহীত হয় তখন এর প্রণেতাগণ বিশেষ বিবেচনা করে শেষ মুহূর্তে 'বিজ্ঞান' কথাটি এই প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত হয় বিশ্ব শান্তি ও মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিগত সম্পর্ক বিকশিত করে তোলা। জাতিসংঘের অন্য কোন কোন সংস্থা — যেমন খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রভৃতি —বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে জড়িত। তবে ইউনেস্কো বিশেষভাবে বিজ্ঞানের বুনিয়াদি শিক্ষা ও গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানুষ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথা শুনলেই আমাদের চোখের সামনে নানা নিত্য ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির দৃশ্য ভেসে ওঠে, যেমন রেডিও, টেলিভিশন, বল-পয়েন্ট কলম, রেফ্রিজিরেটর, মোটর সাইকেল, ডিজিটাল ঘড়ি। এসব জিনিস গত কয়েক দশকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তবু সব দেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বললে মানুষের মনে আজ একই ধারণা সৃষ্টি হয় না। এক্ষেত্রে দেশে দেশে আজো দেখা যাবে অনেক পার্থক্য।

শিল্পোন্নত দেশগুলিতে —যেখানে গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান দৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছে —সাধারণভাবে সবারই মধ্যে এ উপলব্ধি জন্মেছে যে, তাদের জীবনে

এসব স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে অব্যাহত চর্চারই কল্যাণে। অথচ উন্নয়নশীল দেশের নিরক্ষর, দরিদ্র কৃষিজীবী মানুষের কাছে অনেক সময় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন অতি দূরের জিনিস বলে মনে হতে পারে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে উপলব্ধির এই তারতম্য সারা পৃথিবীর অগ্রগতি ও উন্নয়নের পথে এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রেও আজ এমনি বিরাট বৈষম্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ষাট ও সত্তরের দশকে কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের ফলে গম, ধান প্রভৃতি খাদ্যশস্যের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, তাতে অনেক উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগের ফলে বসন্ত, পোলিও, ডিপথিরিয়া, কলেরা প্রভৃতি ব্যাধির বিরুদ্ধে বিরাট বিজয় অর্জিত হয়েছে। আবার একই সময়ে যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও উন্নয়নের খেসারত হিসেবে পরিবেশ দূষণ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যের বিপর্যয়ও বিশ্বব্যাপী গুরুতর সমস্যার জন্ম দিয়েছে।

উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হলেও তারা হুবহু এক জিনিস নয়। বিজ্ঞানের কাজ হল মানুষকে নতুন জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করা। আর প্রযুক্তির কাজ হল সত্য জ্ঞানকে মানুষের প্রয়োজনে নিয়োগ করা। বিজ্ঞান অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্যকে আবিষ্কার করে; প্রযুক্তি সৃজনশীলতার মাধ্যমে সেই সত্যকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগায়।

উন্নত দেশগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তির নানা অবদান প্রায় সবার ঘরে পৌঁছেছে। যাতায়াত ও যোগাযোগের সুযোগ জীবনকে স্বচ্ছন্দ করে তুলেছে; হাড়ভাঙা খাটুনি আর একঘেয়েমি থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছে; মানুষের গড়পড়তা আয়ু বেড়েছে; অনেক ধরনের রোগ-ব্যাধির হাত থেকে মানুষ নিষ্কৃতি পেয়েছে; কাজের ঘন্টা কমেছে; আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর, আনন্দময় জীবন যাপন সম্ভব হয়ে উঠেছে। ক্রমে ক্রমে এসব অবদান উন্নয়নশীল দেশের ঘরে ঘরেও পৌঁছবে— এমন সম্ভাবনা আজ সৃষ্টি হয়েছে।

তবে উন্নয়নশীল দেশের সব মানুষের দোরগোড়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান পৌঁছে দেবার পথে বাধা বিপুল। উন্নত দেশগুলি আজ যে ধরনের সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তা মূলত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির কল্যাণেই ঘটেছে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সেই সঙ্গে এর ফলে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বৈষম্যও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশই আজ প্রধানত সনাতন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল এবং আধুনিক প্রযুক্তির জন্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে উন্নত দেশের মুখাপেক্ষী।

প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এত নানা ধরনের বাধা রয়েছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলির নিজস্ব বিজ্ঞান–প্রযুক্তিগত যোগ্যতা গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই । এসব দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির পথে এমন অনেক সমস্যা রয়েছে যার সমাধান উন্নত দেশগুলি থেকে পাওয়া সম্ভব নয় । নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের ব্যবস্থাপনা, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ব্যাধির নিরাময় ও প্রতিরোধ, এই অঞ্চলের বিশেষ আবহগত সমস্যা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে । একে তো এসব সমস্যার বিষয়ে উন্নত দেশগুলি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে তেমন উৎসাহী নয়, তার ওপর শিল্পোন্নত দেশে উদ্ভাবিত সমাধানগুলি এসব দেশে বাস্তবক্ষেত্রে তেমন কার্যকরও নয় ।

অনেক ক্ষেত্রে শিল্পোন্নত দেশের প্রযুক্তি উন্নয়নশীল দেশে প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখা যায় তার ফলে সে সব দেশের জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে, সামাজিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নানা অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । এমন কি যেসব ক্ষেত্রে বিদেশী প্রযুক্তির বেশি রকম প্রভাব পড়ে সেখানে সমাজ–সম্পর্ক ও মানবিক পরিবেশ বিপর্যস্ত হবার আশঙ্কাও সৃষ্টি হয় ।

পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে মূলত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্ভব আগে ঘটেছে এবং তার পর সে সবের ওপর নির্ভর করে নানা ধরনের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন দেখা দিয়েছে । কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে এর উলটো ব্যাপারটি ঘটে । অর্থাৎ রাস্তাঘাট, যানবাহন, নানা ধরনের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আগে আসে এবং জনসাধারণকে সেগুলির মূলনীতি না বুঝেই সে সব ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয় । মূলনীতি সম্বন্ধে অবহিত না থাকার কারণে নানা নতুন প্রযুক্তির মধ্যে কোনটি দেশের জন্য সবচেয়ে উপযোগী তা বেছে নেয়াও সবসময় জনগণের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না ।

এছাড়া পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের জীবনযাত্রা পদ্ধতি বা চিন্তাচেতনায় যে সব পরিবর্তন এনেছে তা দীর্ঘকাল ধরে কয়েক প্রজন্মব্যাপী ঘটেছে । কিন্তু আজ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তির অনেক ফলাফল এমন দ্রুতগতিতে এসে পৌছচ্ছে যে, তা মানুষের জীবনযাত্রার ধারায় এবং চিন্তাপদ্ধতিতে বড় ধরনের টানাপোড়েন সৃষ্টি করছে । এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শুধু ভোগবাদী দিকটিই প্রাধান্য পাচ্ছে, তার অন্তর্নিহিত যুক্তিবাদিতা, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য মানুষের চিন্তাচেতনায় প্রতিফলিত হচ্ছে না । অন্যদিকে স্বনির্ভর উদ্ভাবনের পথে না এগিয়ে এক ধরনের আত্মবিশ্বাসহীন পরনির্ভরতা প্রশ্রয় পাচ্ছে । এতে যে শুধু দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয়, সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞান–প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগও নষ্ট হচ্ছে ।

আজকের পৃথিবীতে মানুষের চিন্তা–চেতনার দিগন্ত ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে , মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই অগ্রগতি সবদেশে সমতালে ঘটছে না । বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানের এই বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান–প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে ।

বিজ্ঞান–প্রযুক্তির অগ্রগতিতে বৈষম্য

বিশ শতকের শেষ দশকে দাঁড়িয়ে আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে মানব সভ্যতার বিপুল বিকাশ যেমন দেখতে পাই, তেমনি দেশে দেশে বিজ্ঞান–প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপুল বৈষম্যও কারও চোখ এড়িয়ে যায় না । বিজ্ঞান–প্রযুক্তিবিষয়ক সব গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অন্তত ৯৫ শতাংশ আজ সীমাবদ্ধ অল্প গুটিকতক শিল্পোন্নত দেশে; পৃথিবীর সব বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদও সীমাবদ্ধ মাত্র অল্প সংখ্যক উন্নত দেশে । পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলিতে মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা দু' থেকে তিন ভাগ ব্যয় করা হয় বিজ্ঞান–প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে; সেখানে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে এই খাতে ব্যয় মাত্র শতকরা ০.২–০.৩ ভাগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় বরাদ্দ অর্থের বিরাট অংশই আবার নিয়োজিত হয় সামরিক অস্ত্রসম্ভারবিষয়ক গবেষণায় — জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তা তেমন কাজে লাগে না ।

অল্প কিছু উন্নয়নশীল দেশ সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদানকে কাজে লাগিয়ে তাদের উৎপাদন ব্যবস্থাকে খুবই উন্নত পর্যায়ে নিতে পেরেছে । তার ফলে এসব দেশ বিগত দশকে শিল্প ও কৃষি উৎপাদন যেমন বাড়াতে পেরেছে তেমনি জনগণের জীবনযাত্রার মানও যথেষ্ট উন্নত করে তুলেছে । কোন কোন উন্নয়নশীল দেশের আবার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জনসম্পদ আছে, কিন্তু যথেষ্ট অর্থ যোগানোর সামর্থ্যের অভাবে তারা সে জনসম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারছে না । আবার আর কিছু উন্নয়নশীল দেশ যথেষ্ট অর্থসম্পদের অভাবে উপযুক্ত জনসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হিমশিম খাচ্ছে ।

আজকের দিনে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ক্রমেই ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে । অনেক ক্ষেত্রে গবেষণায় সাফল্যের জন্য বিজ্ঞানের নানা বিভাগের কর্মীদের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে । এই পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় দেশের ভেতরে ও বাইরে আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে গবেষণার সমন্বয় ও সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে । কিন্তু এধরনের সমন্বয়ের উদ্যোগ সত্ত্বেও বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ক্রমেই যেন পিছিয়ে পড়ছে । নানা কারণে তারা গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বা জনসম্পদ কোনটিই গড়ে তুলতে পারছে না । প্রযুক্তির ক্রমাগত বিকাশের ফলে উন্নত দেশের সঙ্গে তাদের বৈষম্য নিরন্তর বেড়েই চলেছে ; অবশেষে এমন অবস্থা এসে দাঁড়াচ্ছে যখন তারা নানা ধরনের উন্নত প্রযুক্তি থেকে তাদের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত প্রযুক্তি বেছে নেবার বা সে সব প্রযুক্তি নিজেদের জন্য উপযোগী করে নেবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলছে ।

গবেষণার ধরনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কোন কোন সম্পদশালী দেশ মৌলিক বিজ্ঞানের গবেষণায় বিপুলভাবে বিনিয়োগ করছে, কেননা আজকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার থেকেই আগামী দিনের

প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ঘটে। আবার কিছু সংখ্যক দেশ অল্প সময়ে ফল পাবার আশায় লক্ষ্যমুখী গবেষণার ওপর বেশি করে জোর দিচ্ছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের নতুন ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে বিপুল ও দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখার প্রয়োজনে অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতা থেকে বেরিয়ে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গেও বহুমুখী গবেষণায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাতে নাটকীয় ফল পাওয়া যাচ্ছে।

বিজ্ঞান–প্রযুক্তি ও ইউনেস্কো

ইউনেস্কো তার প্রতিষ্ঠাকালের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়নক্ষেত্রে বরাবরই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা এবং বিশেষভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সহায়তা দানের নীতি অনুসরণ করে এসেছে। আশির দশকের শুরু থেকে ইউনেস্কো পাঁচ বছরের মধ্য–মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে। তার আগে ১৯৭৯ সালের আগষ্ট মাসে ভিয়েনায় ইউনেস্কোর উদ্যোগে উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প ও শিক্ষার সমন্বয়ে কি করে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে সহায়তা করা যায় সে বিষয়ে এই সম্মেলনে কিছু কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। ইউনেস্কোর প্রথম (১৯৮০–৮৫) ও দ্বিতীয় (১৯৮৫–৯০) মধ্য–মেয়াদী পরিকল্পনায় এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সম্প্রতি তৃতীয় (১৯৯০–৯৫) মধ্য–মেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

তৃতীয় মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনায় সাতটি প্রধান কর্মসূচি এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তার মধ্যে "শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ"–এর পরই দ্বিতীয় কর্মসূচি এলাকা হিসেবে "প্রগতির জন্য বিজ্ঞান ও পরিবেশ"–কে স্থান দেওয়া হয়েছে। এর একটি প্রধান দিক হল উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনায় সহায়তা করা। এই লক্ষ্য অর্জনের প্রধান উপায় হবে বিশেষভাবে সবচেয়ে অনুন্নত দেশগুলির বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং মৌলিক, প্রায়োগিক ও প্রকৌশল–বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত করা।

এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষাক্রম নবায়ন, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন। এর মধ্যে তরুণ বিজ্ঞানকর্মীদের প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ করে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, কেননা একটি দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এধরনের প্রশিক্ষণের বিরাট মূল্য রয়েছে। সেই সঙ্গে সবচেয়ে অনুন্নত দেশগুলির গবেষণা সংস্থা ও পেশাজীবী বিজ্ঞানকর্মী সংস্থাগুলিকে সহায়তা দানের দিকেও দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশের বিজ্ঞানকর্মীরা যাতে উন্নত দেশের গবেষণা কার্যক্রমের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে পারেন সেজন্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা ধরনের সহযোগিতামূলক কার্যক্রমও গ্রহণ করা হচ্ছে।

"প্রগতির জন্য বিজ্ঞান ও পরিবেশ" কর্মসূচি এলাকার দ্বিতীয় দিক হল 'পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা'। বিশ্ব পরিবেশের বর্তমান অবস্থা সব দেশের মানুষের কাছে এক বিরাট উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দু'দশকে পরিবেশের সমস্যার আর্থসামাজিক প্রতিক্রিয়া এবং উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্বন্ধে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। অনেক দেশে পরিবেশ সংরক্ষণসংক্রান্ত বিধি–বিধান প্রণীত হয়েছে, উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির আশ্রয়ের জন্য অভয়ারণ্য স্থাপিত হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে অনেক দেশে বায়ুদূষণ ও জলদূষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমানো সম্ভব হয়েছে।

সারা পৃথিবী জুড়ে বনাঞ্চলের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে আসছে; গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনভূমি কমে যাওয়ায় আবহাওয়ার ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে; ভূমিক্ষয় ও মরু–প্রবণতা অনেক দেশে গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে; অম্লবৃষ্টির কারণে বনাঞ্চল ও জলাশয় বিনষ্ট হচ্ছে; কৃষিতে ব্যাপক আকারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার ও শিল্পবর্জ্যের কারণে জলদূষণ ঘটছে; জীবজগতের বৈচিত্র্য হ্রাস প্রভৃতি নানা সমস্যা পরিবেশের ওপর হুমকি সৃষ্টি করে চলেছে। উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রতি বছর চল্লিশ কোটি টনের ওপর বিষাক্ত শিল্পবর্জ্য রপ্তানি করা হচ্ছে। বায়ুমন্ডলে কারবন ডাই–অক্সাইড এবং অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাবার ফলে পৃথিবী জুড়ে গড় তাপমাত্রা বাড়ছে। তার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গিয়ে উপকূলবর্তী অনেক দেশের জন্য গুরুতর বিপদ দেখা দিতে পারে। সেই সঙ্গে বায়ুমন্ডলের উচ্চস্তরে ওজোন গ্যাসের পরিমাণ কমে গিয়ে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিতে সকল প্রাণিদেহে মারাত্মক ক্ষতি ঘটার সম্ভাবনাও বাড়ছে। ইউনেস্কো পরিবেশের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ১৯৭০ সালে 'মানুষ ও জীবমন্ডল' নামে যে কর্মসূচি আরম্ভ করেছিল তা এখনও আন্তর্জাতিক জলতত্ত্ব কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে চালু রয়েছে।

"প্রগতির জন্য বিজ্ঞান ও পরিবেশ" এলাকার তৃতীয় দিক হল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যেমন সমাজকে নানা দিক দিয়ে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে তেমনি আবার সমাজই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্মও দেয়। উন্নয়ন বলতে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশও বোঝায়। আর যেহেতু বিজ্ঞান আধুনিক মানবসভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। আর একারণেই মানবসংস্কৃতির এই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গের ওপর দেশের সমগ্র জনসমাজেরই সর্বজনীন অধিকার বর্তায়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারা যে শুধু সমাজকে প্রভাবিত করে তা নয়, সমাজও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারাকে প্রভাবিত করতে পারে। অবশ্য আধুনিক প্রযুক্তিকে সমাজের বাঞ্ছিত পথে চালিত করার জন্য সমাজের বিভিন্ন সচেতন জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োজন। পরিবেশের ভারসাম্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ এধরনের উদ্যোগের অঙ্গ হতে পারে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে আজ মানুষের সামনে নতুন নতুন নৈতিক সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে ; এসব বিষয়েও সমাজকে সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নানা নতুন ধরনের মারণাস্ত্র বা ওষুধ সম্পর্কে গবেষণা, জীবপ্রযুক্তির নানা উদ্ভাবন, তথ্য-প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্রের ব্যবহার — এসব দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যায়।

ইউনেস্কো সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা ধরনের সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে বেশ কিছু সেমিনার, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে; এছাড়া ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে *Impact of Science on Society* (সমাজের ওপর বিজ্ঞানের অভিঘাত) নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্যোগকেও উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়ন

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বিভিন্ন দেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়ন এবং তার ভিত্তিতে জাতীয় উন্নয়নে পরিকল্পিত উপায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে ইউনেস্কো বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি বিষয়ে ইতোমধ্যে বেশ ক'টি বড় আকারের মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে; সেই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত তরুণ বিজ্ঞানকর্মীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়ন ও গবেষণা ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট করার উদ্যোগও গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিগত দশকগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে। আগামী দশকে এই অগ্রগতি আরো ত্বরান্বিত হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। জীবপ্রযুক্তি, কমপিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি, নতুন গুণাগুণযুক্ত বস্তু প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে যে, তার সঙ্গে অনেক উন্নত দেশের পক্ষেও তাল রেখে চলা আজ দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। বলা বাহুল্য এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে আরো জটিল সমস্যার উদ্ভব ঘটছে। তবে ইউনেস্কোর নানামুখী উদ্যোগ ও কর্মকান্ড আমাদের এই ভরসা দেয় যে, যথাযথ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি গ্রহণ করে স্থির লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হলে উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে দীর্ঘকালের পশ্চাদপদতার গ্লানি ঝেড়ে ফেলা এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথে এগানো কঠিন হলেও মোটেই অসম্ভব নয়।